# ঝড়ের পরে

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র ঘোষাল

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী, এম-এ, বার-এ্যাট্-ল লিখিত

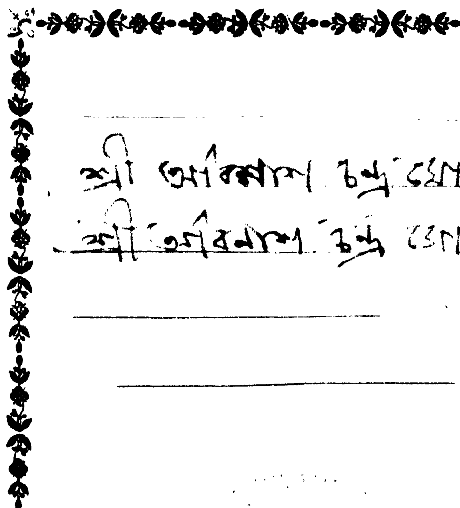
ভূমিকা মণ্ডিত

দাম পাঁচ সিকা

প্রকাশক :—
শ্রীসুরথচন্দ্র মিত্র
১৪, দাস লেন, বহুবাজার
কলিকাতা

পৌষ, ১৩৩৬

প্রিণ্টার :—
শ্রীকমলাকান্ত দালাল
শ্রীঅদ্বৈত প্রেস
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট



পিতৃদেবের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে—

# ভূমিকা

কোনও নবীন সাহিত্যিক তাঁর প্রকাশোন্মুখ পুস্তকের ভূমিকা আমাকে লিখ্‌তে অনুরোধ কর্‌লে, আমি সে অনুরোধ যথাসাধ্য রক্ষা করতে চেষ্টা করি। এর কারণ বাঙ্‌লার সাহিত্য সমাজে আমি কতকটা পরিচিত—নব আগন্তুকরা প্রায়ই অপরিচিত।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, কোন পুস্তকের ভূমিকাকে আমি তার পূর্ব্ব-সমালোচনা মনে করি নে। যিনিই কোনও পুস্তক লেখেন, তিনিই পাঠক-সমাজের বিচারাধীন হ'য়ে পড়েন। আগে-ভাগেই কোনও লেখক কিম্বা তাঁর সাহিত্যিক-বন্ধু সে বিচার করে বস্‌লেই সেটা বিজ্ঞাপনের কোঠায় পড়ে যায়। সাহিত্য সমাজে এ রকম বিজ্ঞাপন যে অনর্থক—সে জ্ঞান আমার আছে। কারণ এ ক্ষেত্রে অযথা প্রশংসা কর্‌লেও পাঠক তাতে সায় দেবেন না।

বঙ্কিমচন্দ্র সেকালের কোন কোনও লেখকের অতি প্রশংসা করেছেন, আবার অন্যদের অতি নিন্দা করেছেন। কিন্তু আজকের দিনে দেখ্‌তে পাই যে, তাঁর অতি-প্রশংসিত এবং অতি-নিন্দিত বাঙ্‌লা সাহিত্য দুই সমান বিস্মৃতির গর্ভে ডুবে গিয়েছে। আমার মনে হয় যে বঙ্কিমচন্দ্র যদি সেকালের নবীন সাহিত্যিক-

দের অত নির্ম্মমভাবে কশাঘাত না কর্‌তেন, তাহলে সম্ভবতঃ তাঁদের মধ্যে দুই একজনও সাহিত্য সমাজে মাথা তুলতে পারতেন। লেখকের প্রথম লেখা যদি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর না হয়, তাহলে তার পরের লেখাও যে নগণ্য হবে, এমন কোনও কথা নেই। যে যথার্থ সাহিত্যিক, সে নিজের লেখারই নিজে সমালোচক; এবং নিজের কাঁচা হাতের লেখার ত্রুটি নিজেই ধরতে পারে। অবশ্য, এমন লেখকও অনেক আছেন যাঁদের হাত আর এজন্মে পাকে না।

আমি আর একটা কারণে নবীন মাত্রকেই উৎসাহ দিতে চাই। বহু লেখককে লেখা সম্বন্ধে উৎসাহিত না কর্‌লে বঙ্গ-সাহিত্যের যথার্থ পুষ্টি হবে না। নিজের নিজের চিন্তা ও কল্পনা ভাষায় প্রকাশ কর্‌বার প্রবৃত্তি যত বেশী লোকের মনে জন্মায়, ততই সাহিত্যের লাভ। কারণ তাতে আর কিছু না হোক, ভাষায় আত্মপ্রকাশ কর্‌বার শক্তি আমাদের জাতের বেড়ে যাবে। বাঙলাভাষার মত ভারতবর্ষে অপর কোন ভাষারই এত অল্পদিনে এত শ্রীবৃদ্ধি হয়নি! বাঙালী আজ নিজের ভাষায় নিজের কথা বল্‌তে শিখেছে।

শ্রীযুক্ত অবিনাশ ঘোষালের পুস্তক হ'চ্ছে কতকগুলি গল্পের সমষ্টি। আমাদের সাহিত্যে ছোট গল্পের স্থান কোথায়, সে বিষয় দু'কথা বলা আবশ্যক। বহুলোকে



# ঝড়ের পরে

## এক

তারানাথ আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে শুনিয়া তাহার মামা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

তারানাথ নিজের পড়ার ঘরে বসিয়া একখানা ইংরাজী পুস্তক পড়িতেছিল; মামার আহ্বান শুনিয়া কোমরের কাপড়টা একটু গুছাইয়া লইয়া বাড়ীর ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বিশ্বেশ্বর বলিলেন, শুন্‌লুম, তুমি পাশ করেছ। এখন কি কর্‌তে চাও?

তারানাথ একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, ওকালতীর একটু চেষ্টা দেখ্‌লে হয় না?

বিশ্বেশ্বর বলিলেন, সেই জন্যেই ত ডাক্‌লুম, তোমার ইচ্ছা

কি? একটা যাহোক ত কিছু করতে হবে। পুরুষ মানুষ বসে থাকলে ত চলবে না।

স্থির হইল, তারানাথ ওকালতী করিবে।

পাশের ঘর হইতে বিশ্বেশ্বরের স্ত্রী সমস্তই শুনিতেছিলেন। তারানাথ চলিয়া যাইলে, তিনি মুখে কাপড় দিয়া হাসি চাপিতে চাপিতে স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, তোমার তারা যদি ওকালতি করে তাহলে আমাকেও তার সঙ্গে বেরুতে হবে।

বিশ্বেশ্বর স্ত্রীর কথার তাৎপর্য্য ঠিক বুঝিতে না পারিয়া, তাহার মুখের দিকে শুধু তাকাইয়া রহিলেন।

মোক্ষদা বলিতে লাগিলেন, এটা আর তুমি বুঝতে পারলে না? যে তারা প্রতিদিন একটা করে ছাতি হারিয়ে আসে, সে যে তার মক্কেলদের মোকদ্দমার কাগজপত্রগুলো হারিয়ে ফেলবে না, তার আর ঠিক কি!

বিশ্বেশ্বর একটু হাসিয়া কহিলেন, তা' বড় মিছে নয়, পরে, ঈষৎ গম্ভীর হইয়া কহিলেন, ভাগ্যে, তুমি আছ, নইলে যে ওর কি হ'তো, তাই ভাবি। পরবার কাপড়খানা পর্য্যন্ত ওকে কেউ পরিয়ে দিলেই যেন ভাল হয়!

মোক্ষদা কহিলেন, মরবার সময় ওর মা যে দুটী হাতে ধরে আমায় ওর সব ভার নিতে বলেছিল, মৃত্যুশয্যার সে আজ্ঞা কি আমি অবহেলা করতে পারি!

বিশ্বেশ্বর উৎসাহিত হইয়া কহিলেন, তারাও কিন্তু আমাদের কোন দিন অসম্মান করেনি।

সে দোষ ওর শত্রুরাও ওকে দিতে পারবে না।

## ঝড়ের পরে

সকালবেলা বিশ্বেশ্বর কি একটা কাজে বাহির হইয়াছিলেন, তাড়াতাড়ি বাড়ী ঢুকিয়া তারানাথকে বলিলেন, একটা ফরসা জামা-কাপড় পরে এস, চন্দ্রনাথবাবু তোমায় দেখ্‌তে এসেছেন।

তারানাথ বিশেষ কিছুই বুঝিল না; শুধু মামার অনুরোধে একটা ফরসা টুইল সার্ট গায়ে দিয়া আসিল মাত্র।

চন্দ্রনাথবাবু একটা মোটা লাঠি হাতে করিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। তারানাথ মামার ইঙ্গিতে তাঁহাকে একটী নমস্কার করিলে, তিনি বলিলেন, তারানাথ, আমার লতিকা-মাকে তোমায় নিতে হবে।

তারানাথ মাথা নীচু করিয়া রহিল। বিশ্বেশ্বরবাবু কহিলেন, সে কথা আর আপনাকে বল্‌তে হবে কেন? লতিকার মত মেয়েকে পাওয়া অনেক পুণ্যের ফল!

চন্দ্রনাথবাবু উৎসাহিত হইয়া কহিলেন. আপনি ত সবই জানেন, কি আর ব'ল্‌ব!

তারপর, বিবাহের দিনস্থির করিয়া, চন্দ্রনাথবাবু বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

তারানাথ এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এইবার সে কথা কহিল। ঘাড় চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিল, বিয়েটা দিন কতক পরে হ'লে হ'তো না?

বিশ্বেশ্বরবাবু হাসিয়া কহিলেন ওসব কথায় তোমায় মাথা বকাতে হবে না। আমরা যা ভাল বুঝ্‌ব ক'র্‌ব।

তারানাথ চিরদিনই শান্ত, ধীর। মামার বিরুদ্ধে কথা কওয়া তাহার স্বভাববিরুদ্ধ।, কিন্তু আজ যেন সে আর চুপ করিয়া

থাকিতে পারিল না। শান্তভাবে কহিল, আমি বল্‌ছিলুম কি, উপার্জ্জন না করে—

বিশ্বেশ্বরবাবুর ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, তুমি কি তর্ক কর্‌তে চাও ?

তারানাথ নিরুত্তর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিশ্বেশ্বরবাবু বলিলেন, যাও, তুমি তোমার নিজের কাজ করগে—ভাল-মন্দ বোঝ্‌বার শক্তি আমার আছে।

তারানাথ যে ভাবে দাঁড়াইয়াছিল, সেই ভাবেই বাহির হইয়া গেল।

বিশ্বেশ্বর ঘরে ঢুকিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, তারানাথের বিয়ের দিনস্থির করে ফেল্‌লুম।

মোক্ষদা কহিলেন, সে কি ? এত শিগগীর নেই বা হ'তো ?

বিশ্বেশ্বর কহিলেন, তুমিও কি তর্ক কর্‌তে চাও না কি ?

মোক্ষদার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। তাহার বহুদিনের সঞ্চিত অভিমান আজ আবার আঘাত খাইয়া দুলিয়া উঠিল। স্বামীর সকল সম্পদে সে গরবিনী। কিন্তু তাহার সকল গর্ব্বের মধ্যে একটা অভাব চিরদিনই তাহাকে অত্যন্ত ছোট করিয়া রাখিয়াছিল। কোন দিনই সে কর্ত্রীরূপে স্বামীর কার্য্যে পরামর্শ দিতে পারে নাই। কেন যে স্বামী তাহাকে চিরদিন এই দিকটা হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল, ইহা সে এত দিনেও বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই। প্রথম প্রথম যুক্তি তর্কের দ্বারা স্বামীকে সে বুঝাইতে চাহিয়াছিল যে সংসারের সেও একজন—বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি তাহারও আছে; কিন্তু কিছুতেই কিছু

হয় নাই। তাই এই অভাবটা সময়ে সময়ে ভিতরে ভিতরে তাহাকে অত্যন্ত পীড়া দিত, কিন্তু মুখের কথায় সে কখনও ইহা প্রকাশ করে নাই—এবারও করিল না।

স্ত্রীকে মৌন দেখিয়া বিশ্বেশ্বর কহিলেন, তুমি নিশ্চয় ভাব্‌ছ, লতিকা আমাদের মধ্যে এসে কেমন করে থাক্‌বে? সে দিকটাও আমি ভেবে রেখেছি। বিয়ের পরেই, আমি স্থির করেছি, ওদের ঝাড়গ্রামে পাঠিয়ে দেব, তাতে তারার প্রাকৃটিসেরও সুবিধা হবে, আর সঙ্গে সঙ্গে, ওরা নিজেদের সংসার নিজেরা বুঝে নিতে শিখ্‌বে।

মোক্ষদা আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। বলিল, তারাকে তুমি একলা রাখ্‌তে চাও? সংসারের সে কী জানে? নিজের খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে যাকে বলে দিতে হয়, সে করবে তোমার সংসার!

বিশ্বেশ্বর কহিলেন, যাতে সেই সব সে শেখে সেই জন্যেই ত এই বন্দোবস্ত করচি।

মোক্ষদা কহিলেন, আমার অন্য কথা তুমি রাখ বা না রাখ, কিন্তু এ মতলব ক'রো না।

বিশ্বেশ্বর কহিলেন, আচ্ছা, ভেবে দেখ্‌ব।

তারপর দিন কতক পরে একদিন তারানাথ স্বামীরূপে লতিকাকে ঘরে লইয়া আসিল। লতিকা পাড়ার মেয়ে। তাহার সম্বন্ধে মোক্ষদা অনেক কিছুই শুনিয়াছিল, তাই তাহাকে ঘরে আনিতে তাহার তেমন ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু স্বামীর একান্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে, তাহার কোন কথাই চলে না। তাই সে চুপ

করিয়াছিল। এখন বৌ দেখিয়া তাহার মনটা বেশ তৃপ্তিবোধ করিল না। কি একটা অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া, তিনি স্বামীকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, যাকে ঘরে নিয়ে এলে, তাকে একটু দেখে-শুনে আনা উচিত ছিল। আমার ত মনে হয়, তারানাথ এ বিয়েতে বিশেষ সুখী হ'তে পারবে না।

বিশ্বেশ্বরের একবার মনে হইল, সে আর ইহা লইয়া বৃথা আলোচনা করিবে না; কিন্তু তাহা হইল না। কহিল, তারা যদি লতিকাকে পেয়ে সুখী হ'তে না পারে, তাহলে জানবে, সেটা তার অত্যন্ত দুর্ভাগ্য!

মোক্ষদা বলিলেন, তুমি কী জান? ওবাড়ীর পিসীমা বললেন, ওরা বাড়ীতে জুতা মোজা পরে থাকে।

বিশ্বেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, ওরাটা কারা?

লতিকা, লতিকার বোন্।

তা আমি জানি। কিন্তু জুতা মোজা পরে বলেই লতিকা একেবারে মেম্ হ'য়ে যায়নি। কাজ-কর্ম্মে মেলামেশায় সে তোমাদের কারুর চেয়ে কম নয়। তা ছাড়া তারানাথ শিক্ষিত। তাকে এক অশিক্ষিতা মেয়ে এনে দিলে তার প্রতি অবিচারই করা হ'তো—লতিকাকে পেয়ে তার জীবন কখনই অসুখী হ'তে পারে না।

স্বামীর কথায় মোক্ষদার চিত্ত পুনরায় বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। সে আর কোন কথা না কহিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মাসখানেক পরে বিশ্বেশ্বর একদিন খাইতে বসিয়া বলিলেন,

আজ ক'দিন ধরে রান্নাগুলোর স্বাদ যেন বদ্‌লে গেছে। তুমি কি নূতন করে আবার রান্না শিখলে না কি ?

মোক্ষদা মৃদু হাসিয়া কহিল, আমাদের আর কি সেকাল আছে ? তবে নতুন লোকেরই রান্না বটে ! আমি এত বারণ করি, লতিকা কিছুতেই শুন্‌বে না। সে বলে, মেয়েদের আসল কাজ রান্না, তা' থেকে তাকে বঞ্চিত কর্‌লে চল্‌বে না। দেখ, তোমার কথাই ঠিক। লতিকা আমার তেমন বৌ নয় ! সে লেখাপড়া জানে বটে, অন্যদিকে একটু সৌখীনও বটে, কিন্তু সাধারণ মেয়েদের কোন কাজই তার অজানা নেই। এই ত ক'দিন এসেছে, কিন্তু এরি মধ্যে সংসারের অর্দ্ধেক ভার সে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে।

বিশ্বেশ্বর হাতের গ্রাসটা মুখে তুলিয়া বলিল, তাহলে দেখ্‌ছ, ভাল-মন্দ বোঝ্‌বার শক্তি আমাদেরও একটু আধটু আছে। তুমি কি মনে কর কিছু না দেখে, না ভেবে, আমি একেবারে তারার বে' দিয়ে ফেল্‌লুম। যেদিন লতিকাকে প্রথম দেখি, সেদিন থেকেই ওকে ঘরে আন্‌বার ঝোঁক চাপে। কিন্তু ওর বাপ্‌কে একথা বল্‌তে কোন দিন সাহস পাইনি। সেদিন যখন তিনি নিজের মুখেই কথাটা পাড়লেন, তখন আমি দ্বিরুক্তি না করে সম্মতি দিয়ে ফেল্‌লুম।

মোক্ষদা খানিক নীরব থাকিয়া কহিল, দেখ, তোমায় আমি একটা কথা ব'ল্‌ব ভাবছিলুম কিন্তু বল্‌তে সাহস হ'চ্চে না।

বিশ্বেশ্বর চুপ করিয়া রহিলেন।

মোক্ষদা ধীরে ধীরে কহিল, তারানাথকে অতো দূরে পাঠিও না, এখানেই সে যেমন আছে থাক্।

বিশ্বেশ্বর কহিল, এখানে থাকলে সে এক পয়সাও রোজগার করতে পার্‌বে না।

কেন? এখানকার উকিলেরা কি সব উপোস করে থাকে?

বিশ্বেশ্বর গম্ভীর হইয়া কহিল, তোমরা বাইরে যাও না, তাই এ কথা ব'ল্‌চ। উপোস করে থাকে কি না একবার খবর নাও না? মোক্ষদা বাধা দিয়া কহিল, কিন্তু তারাকে ত আর রোজ-গারের অভাবে উপোস করে থাক্‌তে হবে না। তার বাপ ত তাকে একেবারে পথে বসিয়ে যায়নি!

বিশ্বেশ্বর কোন উত্তর না করিয়া স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। মোক্ষদা সে চাহনির অর্থ বুঝিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

# দুই

জ্ঞানীরা বলেন, সংসারের কোন বস্তুই অসম্ভব বলিয়া পরিত্যাগ করিবার নয়। যাহা কিছুতেই সম্ভব নয় বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করে, তাহাই যে কেমন করিয়া, কি ভাবে যে একদিন সম্ভবপর হয়, ইহার কোন কারণই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাই যেদিন বিশ্বেশ্বরবাবু তারানথের নিকট হইতে মোটর গাড়ী কিনিয়া পাঠাইবার জন্য একখানা চেক্ পাইলেন, সেদিন তিনি এতটুকুও আশ্চর্য্য হইলেন না। কিন্তু মোক্ষদা শুধু যে আশ্চর্য্য হইলেন তা' নয়, এমন কি ইহা তারানাথের নিজের নয় বলিয়া স্বামীর কথায় প্রতিবাদ করিতে এতটুকুও দ্বিধা করিলেন না।

বিশ্বেশ্বর কহিলেন, যদি বিশ্বাস না হয়, তবে নিজে গিয়ে একবার দেখেই এস না?

মোক্ষদা অভিমানভরে কহিলেন, তোমার তারা কি আর সে তারা আছে যে মামীকে নিয়ে যাবে? এ যে কলিকাল!

কথাটা সত্য! ঝাড়গ্রাম হইতে তারানাথ মাঝে মাঝে চিঠি পত্র লেখে বটে, কিন্তু মামীকে যাইবার জন্য কোন দিন অনুরোধ

করে নাই। কেন যে, বিশ্বেশ্বর তাহা জানিতেন, তাই স্ত্রীকে শান্ত করিবার জন্য বলিলেন, সেখানে গিয়ে খাবে কি? দেখছ না, আলু পাঠাবার জন্যে সে আমাকে লিখেছে।

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আমি যেন আর কিছু বুঝি না!

বিশ্বেশ্বর এই প্রসঙ্গ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে কহিলেন, তোমার গলার হারটা কোথায়? নরহরি বল্‌ছিল, এখন তার কাজ কম আছে, এ সময়ে পেলে সেটা সে শিগ্‌গীর গড়ে দিতে পারবে।

গহনার কথা শুনিয়া মোক্ষদার সমস্ত অভিমান দূর হইয়া গেল। কহিল, হারটা ছিঁড়ে গেছল তাই তাকে সেদিন বলেছিলুম। বৈকালে মনে করে ওটা দিয়ে এস না?

তা' দিয়ে আস্‌ব। কিন্তু কি রকম হবে সেটা ত বলে দিতে হবে।

আচ্ছা, আমি ও বাড়ীর সৌদামিনীর হারটা নিয়ে আস্‌ছি, সেইটে তুমি তাকে দেখিয়ো। এই বলিয়া মোক্ষদা ব্যস্ত হইয়া চলিয়া গেলেন।

স্ত্রীলোকের গহনা যে কত আদরের সামগ্রী বিশ্বেশ্বর তাহা জানিতেন, তাই সময় বুঝিয়া ইহার অবতারণা করিয়া একটা মহা অশান্তির হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিলেন।

মাসখানেক পরে একটা ভারি মোটর গাড়ী তারানাথের বাংলোর ফটকের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। লতিকা কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিল, গাড়ীর আওয়াজ শুনিয়া চাহিয়া দেখিয়া পর্দ্দাটা সরাইয়া দিল। ভৃত্য আসিয়া কহিল, মা, বাগানবাড়ীর চাবি

দিন্। ড্রাইভার বল্‌ছে, গাড়ী এখন ওখানে থাক্‌বে, বাবু বসে গেছেন।

লতিকা উৎফুল্লভাবে কহিল, কার গাড়ী রে ভোলা?

আপনি জানেন না? এ যে আমাদের গাড়ী—কল্‌কাতা থেকে এসে ষ্টেশনে ছিল, পরেশ বাবুর ড্রাইভার গিয়ে এখন নিয়ে এল।

লতিকা বিরক্ত হইয়া কহিল, কি বকৃছিস মিছে পাগলের মত?

ধমক খাইয়া ভোলা একটুও বিচলিত হইল না, বরং আরও জোর করিয়া কহিল, হাঁ মা আমদেরই গাড়ী—ড্রাইভার বল্‌লে।

যা যা, তুই পালা।

চাবি না পাইয়া ড্রাইভার নিজে আসিয়া কহিল যে, সে পরেশ বাবুর ড্রাইভার। তারানাথবাবুর ড্রাইভার এখনও ঠিক হয় নাই বলিয়া তাহাকে ষ্টেশন হইতে গাড়ী আনিবার জন্য তিনি পরেশ বাবুকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

লতিকা চাবি পাঠাইয়া দিল, কিন্তু বিশেষ কিছুই বুঝিল না। কাছারি হইতে তারানাথ ফিরিয়া আসিলে লতিকা একটী একটী করিয়া সমস্ত কথা স্বামীর নিকট হইতে জানিয়া লইল। তিনি যে তাহার সামান্য খেয়ালের জন্য এতগুলা টাকা একেবারে খরচ করিয়া বসিবেন, ইহা সে একবারও ভাবে নাই। সেদিন পরেশ বাবুর গাড়ী দেখিয়া, অমনি একটী গাড়ী হইলে যে বেড়াইবার সুবিধা হয়, কথা প্রসঙ্গে এই কথাটাই স্বামীকে বলিয়াছিল; তিনি যে আর মুহূর্ত্ত মাত্র অপেক্ষা না করিয়া কলিকাতায় টাকা পাঠাইয়া দিবেন, ইহা সে কল্পনাই করে নাই।

কাজ-কর্ম্ম সারিয়া মক্কেলদের বিদায় করিয়া তারানাথ যখন

ঘরে শুইতে আসিল, লতিকা কহিল, মিছামিছি অতগুলা টাকা নষ্ট কর্‌লে কেন বল ত ?

তারানাথ কহিল, নষ্ট হয়েছে এ কথা বল্‌লে কে ?

লতিকা কহিল, বল্‌বে আবার কে ? আমি কি কিছু বুঝি না ?

আচ্ছা, অপরাধ হয়েছে। এই প্রথম অপরাধ ক্ষমা করুন হুজুর ! বলিয়া সে ঠিক অপরাধীর মত হাতজোড় করিল।

লতিকা হাসিয়া কহিল, হ'লেই বা প্রথম অপরাধ, শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে, এই বলিয়া দুই বাহুর দ্বারা স্বামীকে জড়াইয়া ধরিয়া পরম আনন্দে তাহার মুখচুম্বন করিল।

অন্যদিনের মত সকাল হইতেই তারানাথ বাহিরের বারাণ্ডায় আসিয়া বসিল। মনুয়ার মা চা লইয়া আসিলে তারানাথ কহিল, এত দেরী হ'লো যে ?

কি ক'রব বাবু, মনুয়ার কাল একটী ছেলে হয়েছে, সারারাত কি আর কাল ঘুম হয়েছে ? ভাগ্যে মা গেছলেন তাই ত তবু আস্‌তে পারলুম, নইলে যে কি হ'তো ?

এ বাড়ীতে ঝি চাকরেরা যে কাহাকে মা বলিয়া ডাকিত. তারানাথ তাহা জানিত। তাই সে আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, কে গেছ্‌ল বল্‌লি ?

কেন বাবু, মা। উনি কম লোক না কি ? সাক্ষাৎ ঠাকুর বাবু, সাক্ষাৎ ঠাকুর, বলিয়া সে উদ্দেশ্যে মাথা নত করিল।

আচ্ছা তুই যা, বলিয়া তারানাথ চা পান করিতে লাগিল।

লতিকা যে এই দুঃখী স্ত্রীলোকের বিপদে সাহায্য করিতে কাল রাত্রে শয্যা হইতে উঠিয়া গিয়াছিল, ইহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। সারাদিনের পরিশ্রমে সে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাই কখন যে সে উঠিয়া গিয়াছিল, আবার কখন যে সে ফিরিয়া আসিয়াছিল, ইহা সে কিছুই জানিতে পারে নাই। কিন্তু যতই সে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিল ততই লতিকা যেন তাহার নিকট একটা রহস্য, একটা প্রহেলিকা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এই অল্প বয়সে সকল কর্ম্ম করিবার এরূপ দক্ষতা সে আর কোন নারীর মধ্যে দেখিয়াছে কি না একবার ভাবিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার মনের কোণে কেহই স্থান পাইল না।

এমন সময় এক থালা গরম লুচি ও এক ডিস্ গরম হালুয়া লইয়া লতিকা উপস্থিত হইল।

তারানাথ চায়ের বাটী হইতে মুখ তুলিয়া কহিল, এবার আমায় একটু কড়া হ'তে হবে দেখ্ছি।

লতিকা মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল; মনুয়ার মা যে সমস্ত বলিয়া গিয়াছে ইহা সে বুঝিতে পারিল।

কি হাস্ছ যে?

লতিকা বলিল, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। আমাদের স্কুলে একজন মাষ্টার ছিলেন, কেউ যদি তাঁকে না বলে ক্লাস থেকে বেরিয়ে যেত, তাহলে তিনি রেগে একেবারে কুরুক্ষেত্র করতেন, বলিয়া সে আবার হাসিতে লাগিল। আমাকেও দেখছি তেম্নি একটা কিছু হ'তে হবে।

কিন্তু তুমি ত আর তা' নয়, বলিয়া তারানাথের চোখের উপর সে যেন সৌন্দর্য্যের একটা পিচকারী ছুঁড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

তৃপ্তি কি আনন্দ, তারানাথ কিছুই বুঝিল না, কিন্তু সেই যাওয়ার পথটাতেই সে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল।

## তিন

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ধীরে ধীরে সারাআকাশ ব্যাপ্ত করিয়াছে। একটা আরামকেদারায় তারানাথ হাতের উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে, কি জাগিয়া আছে, কিছুই বুঝা যায় না। তাহারই পাশের ঘরে লতিকা মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত আর কোথাও কোন সাড়া নাই, শব্দ নাই; কেবল আশে-পাশের গাছের পাতাগুলা একটু নড়িয়া উঠিয়া এই স্তব্ধ গৃহের প্রাণী দুটীকে যেন বাহিরের অস্তিত্ব স্মরণ করাইয়া দিতেছে। কেন এমন হইল? কি জন্য আজ এই দুটী নর নারী তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের আনন্দ উৎসব পরিত্যাগ করিয়া এমন করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে? এ ত তাহাদের স্বামী-স্ত্রীর কলহ নহে! এ যেন কোন নিষ্ঠুরের বিরুদ্ধে দারুণ অভিমান! যেন শক্তি নাই বলিয়া তাহারা এই বিরাট অত্যাচার মুখ বুজিয়া সহ্য করিয়া রহিয়াছে! হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাসে ঘরের সমস্ত বায়ু যেন বাধা পাইয়া উঠিল। তারানাথ ধীরে ধীরে চেয়ারের উপর উঠিয়া বসিল। তারপর এদিক ওদিক একবার ভাল করিয়া

দেখিবার চেষ্টা করিয়া সে যেন দুইটী চক্ষুর সমস্ত দৃষ্টি একত্রিত করিয়া সম্মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। লতিকা একবার একটু পাশ ফিরিয়া যেমন পড়িয়াছিল, তেম্নি পড়িয়া রহিল।

সকালবেলায় একখানা গাড়ী করিয়া পরেশবাবু তাঁহার ভগ্নিকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। পরেশবাবু উকিল, তারানাথের বিশেষ বন্ধু। কি একটা কাজে কাল রাত্রে তিনি বাড়ী ছিলেন না। সকালবেলা বাড়ী ফিরিয়া যখন শুনিলেন যে, তারানাথের তিন বৎসরের শিশু গত রাত্রে বিসূচিকা রোগে মারা গিয়াছে, তখন তিনি কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হইয়া রহিলেন; এবং এই দারুণ শোক যে এই দুটী স্ত্রী-পুরুষকে কোথায় টানিয়া লইয়া যাইবে, ইহাই মনে মনে চিন্তা কবিতে লাগিলেন।

ফটকের একটা ধারে দাঁড়াইয়া ভোলা গাছের একটা ডাল ভাঙ্গিতেছিল। পরেশবাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবু কোথায় রে?

ভোলা কহিল, আজ্ঞে ভিতরে আছেন।

অতি সন্তর্পণে তাঁহারা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তারপর শোকের যে চিহ্ন তাঁহারা আজ স্বচক্ষে দেখিলেন তাহা লিখিয়া বর্ণনা করিবার শক্তি নাই। ব্যথা যে এমনি করিয়া মানুষকে আচ্ছন্ন করিতে পারে তাঁহারা আজ ইহা প্রথম উপলব্ধি করিলেন। কিন্তু বেদনা যত বড়ই হউক তাহাকে সহ্য করিবার শক্তি ভগবান দিয়াছেন, তাই আবার সেদিন গাড়ী চড়িয়া কাগজ-পত্র লইয়া যখন তারানাথ কাছারিতে বাহির হইল তখন পরেশবাবুও এতটুকু বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না।

কিন্তু এই শোকের মধ্যে লতিকার জীবনে একটা নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। তাহাকে দেখিলেই মনে হইত, তাহার ভিতরে একটা কিসের দ্বন্দ্ব সুরু হইয়াছে। একদিন সে পরেশ-বাবুর বাড়ী যাইয়া তাঁহার ভগ্নীকে ধরিয়া বসিল যে, তাহাকে তাঁহার গুরুদেবের নিকট লইয়া যাইতে হইবে। সরোজিনী কহিল, এত তাড়া কেন ভাই? যখন সময় হবে, তখন কেউ আট্‌কাতে পারবে না।

এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন। পরেশবাবুর ভগ্নী সরোজিনী অতি অল্পবয়সে বিধবা হইয়া এক গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। সেই অবধি তিনি তাঁহাকে ভগবানের অংশ বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছেন। লতিকা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার জীবন যাপন করিবার প্রণালী, তাঁহার কথাবার্ত্তা, তাঁহার সমস্ত কিছুরই মধ্যে বেশ একটা মাধুর্য্য অনুভব করিত। যাঁহার কৃপায় সরোজিনীর এই সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে, সেই পূজ্যপাদ গুরুদেবকে তাহারও একবার দেখিবার বড় সাধ। তিনি যে মহাপুরুষ, তাঁহার নিকট যাইলে যে সমস্ত ব্যথা দূর হইয়া যাইবে, ইহা সে যেন সূর্য্যের আলোকের মত স্পষ্ট অনুভব করিল।

মাসকয়েক পরে একদিন সে সরোজিনীকে লইয়া তাঁহার গুরুর নিকট যাইয়া উপস্থিত হইল। সারাটা দিন যে তাহার কোথা দিয়া কেমন করিয়া কাটিল, ইহা সে ধারণাই করিতে পারিল না। সন্ধ্যার সময় যখন সে বাড়ী ফিরিল, একটা অতৃপ্তিতে তাহার সমস্ত চিত্ত ভরিয়া গেল। অন্যদিনের মত

আজিও সে স্বামীর খাওয়ার সময় কাছে গিয়া বসিল, কিন্তু কেমন যেন তাহার ভাল লাগিল না। তারানাথ ইহা লক্ষ্য করিল, কিন্তু কোন প্রশ্ন করিল না।

ইহার কিছুদিন পরে একদিন লতিকা গুরুদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিল। আসিবার সময় গুরুদেব তাহাকে বারংবার বলিয়া দিলেন, দেখ মা, যা বলে দিলাম সেই পথে সর্ব্বদা চল্‌তে চেষ্টা করবে। কোনদিন কোনও কারণে যেন তা' থেকে ভ্রষ্ট হ'য়ো না—তাহলে সমস্ত শ্রম পণ্ড হয়ে যাবে। এই কথাটা কখনও মনে ক'রো না যে, তোমার এই দেহটাই সব—আর বাকি সব মিথ্যা। গভীর শ্রদ্ধায় লতিকা তাঁহার পদস্পর্শ করিয়া কহিল, আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনার কথাই সফল হয়।

গুরুমন্ত্র গ্রহণ করিয়া লতিকা পুরাপুরি একটা নূতন জীবন স্থরু করিয়া দিল। পূর্ব্বের মত বেশভূষা তাহার তেমনিই রহিল বটে, কিন্তু জপতপের মাত্রাটা তাহার অসম্ভব রকম বাড়িয়া উঠিল। একদিন তারানাথ কহিল, যে রকম আরম্ভ করেছ, এতে বনে না গেলে আর উপায় নেই।

লতিকা স্বামীর হাতদুটা ধরিয়া কহিল, দেখ, তুমি যা বল্‌বে আমি সব শুনব, কিন্তু আমার এই দিক্‌টায় তুমি বাধা দিতে চেষ্টা ক'রো না।

তারানাথ কোনদিনই স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করে নাই। যখন বুঝিল যে, লতিকা ইহাকেই তাহার জীবনের সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লইয়াছে, তখন ভাল হউক, মন্দ হউক, ইহাতে বাধা দিয়া সে অনর্থক একটা অশান্তি সৃষ্টি করিতে চাহিল না।

# চার

স্বামীর নিকট অবাধ স্বাধীনতা পাইয়া লতিকা ধীরে ধীরে তাহার জীবনের নূতন পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। বাহিরের সমস্ত আবরণ যেমন ছিল তেমনিই রহিল, কিন্তু অন্তরের মধ্যে বিপুল পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। আজও সে স্বামীর খাওয়ার সময় কাছে আসিয়া বসে, কাছারি যাইবার সময় জামা-কাপড় গুছাইয়া দেয়, কিন্তু বেশ বুঝা যায়, এগুলাতে যেন আর তাহার কোন প্রাণ নাই,—শুধু করিতে হয় বলিয়াই করিতেছে। পাছে স্বামী অসন্তুষ্ট হন্, পাছে এই আত্মনির্ভরশূন্য লোকটী তাহার যত্নের অভাবে বিব্রত হইয়া পড়ে, ইহার জন্য সকল সময় সে সতর্ক থাকিত। কিন্তু গুরুদেবের কঠিন আদেশে স্বামীর শয্যা হইতে নিজেকে সে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করিয়া রাখিল। তারানাথ যে ইহা বুঝিত না, তাহা নহে, কিন্তু স্ত্রীকে এই দিক্‌টায় ইঙ্গিত করিতে কেমন যেন তাহার বাধ বাধ ঠেকিত।

লতিকা কিন্তু বেশ বুঝিত, এত সহজে সে স্বামীর নিকট

হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। একদিন না একদিন এই মিথ্যা লজ্জা ভাঙিয়া গিয়া তাঁহাকে একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিবে। সেদিন এই দেহটাকে সে যে কোথায় লুকাইয়া রাখিবে, ইহার জন্য সদাই সে সশঙ্কিত থাকিত। এমন করিয়াই বা কতদিন কাটিবে? তাই সে একদিন স্থির করিল, স্বামীকে সকল কথা খুলিয়া বলিবে, এবং সে যে আর এই দেহটাকে কখন তাঁহাকে উপহার দিতে পারিবে না, এই কথাটাই তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবে। এই মনে করিয়া সেদিন সে স্বামীর শোবার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। তারানাথ তখন মস্ত একটা লেপ গায়ে দিয়া বিছানার উপর পড়িয়াছিল। লতিকা কহিল, তোমায় একটা কথা বল্‌তে এলুম।

তারানাথ ইহার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না। তাই সে শুধু তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। তারপর উঠিয়া বসিয়া কহিল, কি কথা?

লতিকা শান্তভাবে কহিল, বল্‌ছিলুম কি, তুমি আবার একটা বিবাহ কর।

তারানাথ কোন প্রত্যুত্তর করিল না, শুধু স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। ইহা যে উপহাস নহে, লতিকা যে সত্য সত্যই তাহার সহিত আজ একটা বুঝাপড়া করিতে আসিয়াছে, ইহা সে বুঝিল।

স্বামীকে মৌন দেখিয়া লতিকা কহিল, তুমি হয় ত ভাব্‌ছ, এর প্রয়োজন কি? কিন্তু, আমি সবদিক বেশ করে ভেবে দেখ্‌লুম, এর প্রয়োজন আছে।

তারানাথের দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সে কি

একটা কথা বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার কণ্ঠ-রুদ্ধ হইয়া গেল।

লতিকা পাষাণের মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। স্বামী যে তাহাকে কত ভালবাসেন, সে তাহা জানিত, কিন্তু আর যে কোন উপায় নেই! যে পথে সে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে, সেখান হইতে সে যে আর ফিরিতে পারে না! সংসারের সমস্ত বন্ধন তাহাকে ধীরে ধীরে ছিন্ন করিতে হইবে, নচেৎ চলার পথে তাহার অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইবে। এই চিন্তা করিয়া সে পুনরায় কহিল, আমাকে ক্ষমা কর—আমায় মুক্তি দাও। যতদিন আমার এই দেহটার না ধ্বংস হয়, ততদিন আমি তোমার সেবা করব—তোমার দাসী হয়ে থাকব, কিন্তু—

তারানাথ নিজেকে সংযত করিয়া কহিল, তাই আমার যথেষ্ট হবে লতিকা—তার বেশী আর আমি কিছু চাই না।

ইহার পর লতিকা আর কোন কথা কহিতে পারিল না; ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তারানাথ স্থির করিল, লতিকা যদি নারী হইয়া নিজেকে সংযত করিতে পারে, সে-ই বা পারিবে না কেন? তা' ছাড়া, কোনও ক্রমে যদি তার দুর্ব্বলতা লতিকার নিকট ধরা পড়িয়া যায়, তাহা হইলে প্রকৃতই সে অত্যন্ত ছোট হইয়া যাইবে। তাই সে তাহার সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়া ইহার বিরুদ্ধে সজাগ হইয়া রহিল।

নিজের সহিত যুদ্ধ করিয়া তারানাথ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। আর পূর্ব্বের মত কাজকর্ম্ম করিতে পারে না। সকল বিষয়েই

যেন একটা শৈথিল্য, একটা ঔদাসীন্য আসিয়া পড়িয়াছে। কখন কখন জোর করিয়া সে তাহার কার্য্যগুলি শেষ করিতে চাহিত, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আর যেন উৎসাহ থাকিত না। যাহার সুখের জন্য তাহার পরিশ্রমের আর আদি-অন্ত ছিল না, আজ তাহাকে হারাইয়া তাহার হাত পা যেন অসাড় হইয়া পড়িয়াছে। ইহার জন্য আজ সে কাহারও নিকট নালিশ করিল না, শুধু অন্তরের আগুনে নিজেই পুড়িয়া ছারখার হইতে লাগিল।

স্বামীর এই পরিবর্ত্তন লতিকা লক্ষ্য করিল। কিন্তু সংসারের মোহ সে সকল রকমে পরিত্যাগ করিতে চাহে, তাই স্বামীর যন্ত্রণা তাহাকে পীড়া দিতে পারিল না।

শীতের জলো হাওয়ায় ঘরের ভিতরটা ঠাণ্ডায় ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছিল। তারানাথ ধীরে ধীরে পশ্চিমের জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল। অন্যদিনের মত আজও সে বিছানার একটা ধারে শুইয়া পড়িল, কিন্তু দুশ্চিন্তা এম্‌নি করিয়া তাহার মাথার মধ্যে ছুটাছুটি করিতে লাগিল যে, কিছুতেই সে আর চোখ বুজিতে পারিল না। হঠাৎ তাহার মনে হইল, এ অন্যায়! এ অবিচার! কাহার সাধ্য লতিকাকে তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লয়? যাহাকে সে একদিন নারায়ণ সাক্ষী করিয়া ঘরে আনিয়াছে, তাহার উপর তাহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। লতিকা যদি ভ্রমবশে একটা কার্য্য করিতে চাহে, স্বামী হইয়া সে তাহাকে বাধা দিবে না কেন? সে আর স্থির থাকিতে পারিল না, একেবারে বিছানার উপর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ঘরের দরজাটা খুলিয়া ফেলিল। চারিদিকে অন্ধকার। আস্তে আস্তে সে লতিকার ঘরের সম্মুখে

আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, দরজা বন্ধ, শুধু একটা জানালা খোলা রহিয়াছে। তাহারই ভিতর দিয়া সে দেখিতে পাইল, ঘরের ভিতরে লতিকা প্রকাণ্ড একটা ত্রিশূল সম্মুখে রাখিয়া আগুন জ্বালাইয়া নিমীলিত নেত্রে বসিয়া রহিয়াছে। তস্কর যেমন করিয়া গৃহস্থের বহুমূল্য দ্রব্য লইয়া পলায়ন করে, তেম্‌নি করিয়াই সে লতিকার নিকট হইতে তাহার স্বামীত্বের শেষ দাবীটুকু কাড়িয়া লইতে আসিয়াছিল, কিন্তু পরীক্ষার সময় তাহার দুর্ব্বল মন তাহাকে কোন শক্তিই দিল না। সে যেমন আসিয়াছিল, তেম্‌নি ফিরিয়া গিয়া ঘরের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল।

বৈকালে বেশভূষা করিয়া সাজিয়া-গুজিয়া লতিকা আসিয়া স্বামীকে কহিল, আজ পরেশবাবুর ছেলের ভাত, যেতে যেন ভুলো না। তিনি গাড়ী পাঠিয়েছেন, আমি চল্‌লুম।—বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

গতরাত্রির ব্যাপার লইয়া তারানাথ আজ সারাদিন ধরিয়া নিজের মনের সহিত একটা সন্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছিল, হঠাৎ লতিকা আসিয়া তাহার সমস্ত উদ্দেশ্য যেন বিফল করিয়া চলিয়া গেল। তাহার আজিকার বেশভূষা, কথা বলিবার অপূর্ব্ব ভঙ্গী, এম্‌নি করিয়া তাহাকে পাইয়া বসিল যে, সে যে তাহার নয়, একথা কোনমতেই সে আজ বিশ্বাস করিতে পারিল না। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে হইল, ইহা ত নূতন নহে! লতিকা যে এম্‌নি করিয়াই তাহার বাহিরটাকে ফাঁকি দিতে চাহে—বাহিরের আলোচনাটা যে এম্‌নি করিয়াই সে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে!

অপরে যখন তাহাকে তাহাদেরই একজন বলিয়া স্থির করিয়া লয়, লতিকা তখন মনে মনে হাসে, কিন্তু প্রতিবাদ করে না। তারানাথ ইহা জানিত, তাই তাহার বেশভূষা, শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে কোন আশা দিল না।

প্রথম সন্তানের অন্নপ্রাশন বলিয়া পরেশবাবু এতটুকুও কৃপণতা করেন নাই। গ্রামের প্রায় সকলকেই তিনি নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার বিনয় ও সৌজন্যের জন্য সকলেই তাঁহার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। বিনোদিনীও স্বামীর সকল গুণ অধিকার করিয়াছিলেন। লোকজনের সমাগমে আজ আর তাঁহার একটুও বিশ্রাম করিবার উপায় ছিল না। কিন্তু এত পরিশ্রমেও তাঁহার আজ আর ক্লান্তি নাই!

লতিকা এই সৌভাগ্যবতী নারীর প্রতি চাহিয়া চাহিয়া মনের মধ্যে কেমন যেন একটা বেদনা বোধ করিতে লাগিল। ইহা ক্ষণিক, ইহা সত্য নহে, এম্‌নি নানান্ যুক্তির দ্বারা নিজেকে সে ভুলাইতে চাহিল, কিন্তু বহুদিনের পুরাণো ব্যথাটা আজ যেন নূতন হইয়া তাহার বুকের মধ্যে খচ্ খচ্ করিয়া বাজিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, বিশু যেন সত্য তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যায় নাই, আজও সে যেন তাহার হৃদয়ের কোন্ নিভৃত প্রদেশে লুকাইয়া রহিয়াছে। বিশুর চিন্তা তাহাকে এম্‌নি করিয়া আচ্ছন্ন করিল যে, কবে সে তাহার মুখের উপর পড়িয়া 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিয়াছিল, কবে রাগ করিয়া সে আর 'মা' বলিয়া ডাকিবে না বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিল, সে যেন সেসব চোখের উপর দেখিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার

মাথার ভিতরটা বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিয়া উঠিল এবং কোন রকমে টলিতে টলিতে পাশের রেলিংটা ধরিয়া ফেলিল।

বাড়ী ফিরিয়া অন্যদিনের মত আজ আর সে পূজার সামগ্রী লইয়া বসিতে পারিল না। কোন রকমে জামা-কাপড় পরিবর্ত্তন করিয়া খালি মাদুরটার উপর শুইয়া পড়িল, এবং শ্রান্তিতেই বোধ করি ঘুমাইয়া পড়িল।

রাত্রি তখন গভীর হইয়াছে। কোথাও কোন সাড়া নাই, শব্দ নাই; শুধু বাহিরের বারিধারা ধরিত্রীর বুকের উপর পড়িয়া ঝম্ ঝম্ শব্দ করিতেছে। এম্নি সময়ে লতিকার হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার বুকের ভিতরটা কে যেন মুগুর মারিয়া গুঁড়া করিতে লাগিল। আজ এক নিমিষেই সে স্থির করিয়া ফেলিল, না—এখনও সময় আছে! এখনও ভগবান তার সে পথ বন্ধ করেন নাই! এতদিন সে যাহাকে অবহেলা করিয়াছে সেই-ই সত্য—সেই-ই তার নারীজীবনের পরম ধর্ম্ম।

সে আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিল না; একেবারে স্বামীর ঘরের দিকে ছুটিয়া গেল। কিন্তু হায় রে, যাহাকে আজ তাহার সব চেয়ে প্রয়োজন, সেই-ই আজ প্রয়োজন নাই ভাবিয়া বন্ধুর বাড়ী বসিয়া রহিয়াছে। স্বামীর উপর আজ তাহার বড় রাগ হইল। কেন তিনি তাঁহার দাবী জোর করিয়া আদায় করিয়া লন্ নাই? কেন তিনি এ সমস্ত মুখ বুজিয়া সহ্য করিয়াছেন?

সে আর দাঁড়াইতে পারিল না; আর কিছু ভাবিতে পারিল না; উন্মাদের মত বিছানার উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া স্বামীর মাথার বালিশটা দুই হাতে সজোরে আঁকড়াইয়া ধরিল।

# স্বামীর বুকে



## এক

স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সপ্রমাণ করিয়া মেয়েস্কুলের গাড়ীটা যখন নির্ম্মলের বাড়ীর সাম্‌নে দিয়া চলিয়া যাইত, তখন কোনমতেই সে আর নিজেকে বাড়ীর ভিতর আবদ্ধ রাখিতে পারিত না। দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যে ইহাও তাহার জীবনে এম্‌নি নিত্য হইয়া উঠিয়াছিল যে, ইহা হইতে অব্যাহতি লাভের সে যতবার চেষ্টা করিয়াছে, প্রতিবারেই তাহার নিষ্ফলতা জয়ী হইয়া তাহাকে ব্যঙ্গ করিয়াছে। বন্ধুমহলেও কথাটা প্রচার হইতে বিলম্ব হয় নাই, কিন্তু যে নেশা তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া প্রতিদিন ঠিক একই স্থানে একই সময়ে টানিয়া আনিত, সে তীব্র নেশা সে কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারে নাই। সে শিক্ষিত, সে বুদ্ধিমান; তাহার শিক্ষিত অন্তঃকরণ ইহার কুৎসিত

দিকটা তাহাকে বারংবার কাণ ধরিয়া বুঝাইয়া দিয়াছে, কিন্তু এই সামান্য দুর্ব্বলতাটুকু যে কেমন করিয়া তাহার সমস্ত সাধু চেষ্টাকে নিস্ফল করিয়া দিয়াছে, ইহা সে তাহার সমস্ত বুদ্ধি দিয়াও উপলব্ধি করিতে পারে নাই। মানুষ যে কত দুর্ব্বল, তাহার সমস্ত দম্ভ ও অহঙ্কারের মূল্য যে কতটুকু, এই তুচ্ছ ঘটনা হইতে সে তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছে, তাই পরাজয়ের সমস্ত অপমান সহ্য করিয়া গাড়ীর আওয়াজে প্রতিদিনই সে বাহির হইয়া আসে, কোনদিন কোনও কারণে ইহার ব্যতিক্রম হয় না।

কিন্তু চিরদিন সে এম্নি ছিল না। গাড়ীর শব্দ, বিপুল জনতার অসহ্য কলরব, কোনদিন তাহাকে তাহার পড়িবার ঘর হইতে বাহির করিতে পারে নাই। কিন্তু আজ তাহার সে নিষ্ঠা কোথায়? ছাত্রজীবনের যে কঠোরতা পালন করিয়া একদিন সে নিজেকে কর্ত্তব্যপরায়ণ মনে করিয়াছে, আজ তাহার সে শক্তি কোথায়? কে তাহার একনিষ্ঠ জীবনে চাঞ্চল্যের স্রোত বহাইয়া দিল? কে আজ তাহাকে নূতন নেশায় মাতাইয়া তুলিল?

সহরের এক রঙ্গালয়ে সেদিন সে তন্ময় হইয়া অভিনয় দেখিতেছিল। ইহার পূর্ব্বে আরও দু'একটী অভিনয় সে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতে দেখিয়াছে, কিন্তু একটা কাল্পনিক বস্তু যে এমন বাস্তব হইয়া মানুষকে আকুল করিতে পারে, ইহা সে কোনদিন অনুভব করে নাই। হঠাৎ কিসের আঘাতে তাহার সে তন্ময়তা ভঙ্গ হইয়া গেল। পিছন ফিরিয়া দেখিল একটী তরুণী অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে; এবং তাহারই পার্শ্বস্থিত একটী ভদ্রলোক কুণ্ঠিতভাবে কহিলেন, কিছু

মনে করবেন না, ছড়িটা তুল্‌তে গিয়ে আমার ভাগ্নীটী আপনাকে আঘাত করে ফেলেছে। নির্ম্মল ততোধিক বিনীতভাবে কহিল, এর জন্য আপনি কুণ্ঠিত হবেন না, এমন হয়েই থাকে। কিন্তু বেশ বুঝা গেল, ইহাতে অপরাধীর লজ্জা এতটুকু কমিল না, বরং অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়া তাহার সমস্ত মুখখানি এক অপরূপ রঙে রঙীন হইয়া উঠিল। ইহা অতি তুচ্ছ, কিন্তু এই তুচ্ছ বস্তুটী সে রাত্রের ঐ চিত্তাকর্ষক নাটকের বাকিটুকু আর নির্ম্মলকে তন্ময় করিতে পারিল না। তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল যে, আর একবার সে ফিরিয়া দেখে, কিন্তু ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিয়া পিছন ফিরিয়া এই নারীর ঐ মাধুর্য্যটুকু উপভোগ করিতে সে কোনমতেই সমর্থ হইল না। অভিনয় শেষে সকলে যখন স্ব স্ব স্থান পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন আর একবার সে তাহাকে দেখিয়া লইল, এবং নারীর যে রূপটার সহিত এতদিন তাহার পরিচয় ঘটে নাই, আজ তাহারই সে যেন একটা নমুনা পাইল। বাড়ী ফিরিয়া এত রাত্রেও সে আজ ঘুমাইতে পারিল না—একটা নূতন চাঞ্চল্য তাহার সমস্ত দেহ ও মনকে এম্‌নি অভিভূত করিয়া ফেলিল যে কিছুতেই সে শান্ত হইতে পারিল না। ভোরের দিকে কখন যে তাহার বিক্ষিপ্ত চিত্ত শান্ত হইয়া তাহাকে সুপ্তির ক্রোড়ে ঠেলিয়া দিয়াছিল, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই; যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন একটা গভীর অবসাদে তাহার সমস্ত চিত্ত ভরিয়া গিয়াছে; এবং উষার যে নবীনতা মানুষকে আবার সজীব করিয়া তাহাকে তাহার কর্ত্তব্য কার্য্যে উৎসাহিত করিয়া তোলে, ইহার সে শক্তি আজ যেন হ্রাস হইয়া গিয়াছে।

অন্যদিনের মত আজ আর তাহার পড়িবার উৎসাহ ছিল না, তাই ছাদের ভাঙ্গা বেঞ্চিটার উপর সে শুইয়া পড়িল, এবং ক্লান্তিতেই বোধ করি প্রভাতের নির্ম্মল বাতাসে পুনরায় সে ঘুমাইয়া পড়িল।

চায়ের সময় নির্ম্মলকে দেখিতে না পাইয়া তাহার জননী কহিলেন, হাঁরে শিবু, আজ তোর দাদা কোথায়?

শিবু কি একটা কাজে ছাদে গিয়াছিল, তাই কহিল, দাদা যে ছাদে ঘুমুচ্ছে।

এখনও ঘুমুচ্ছে? কেন? এই বলিয়া তিনি ছাদে আসিয়া দেখিলেন যে শিবুর কথাই সত্য। ভাঙ্গা বেঞ্চিটায় হাতের উপর মাথা রাখিয়া নির্ম্মল অসাড়ে ঘুমাইতেছে, আর রৌদ্র তাহার মুখের উপর পড়িয়া তাহাকে ঘর্ম্মাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। তিনি শশব্যস্তে তাহার মাথাটা নাড়া দিয়া কহিলেন, ওঠ্‌রে, বেলা হ'য়ে গেছে; এই রৌদ্রে কি করে শুয়ে আছিস?

মাতার আহ্বানে নির্ম্মলের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া কহিল, উঃ, এত রোদ হ'য়ে গেছে, কেউ আমায় ডেকে দেয়নি!

কি করে জান্‌ব বল্‌? শিবুর কাছে শুন্‌লুম, তুই ছাদে ঘুমুচ্ছিস, তাই ত আমি ছাদে এলুম। কাল কি তুই রাত্রে ঘরে এসে শুস্‌নি?

নির্ম্মল ইহার কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইল না, তাই চোখ রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে সে যাহা বলিল তাহা তাহার জননীর বেশ হৃদয়ঙ্গম হইল না। তিনি পুত্রের কপালে হাত দিয়া

কহিলেন, তোর ত জ্বর হয়নি? চোখদুটা এত লাল কেন? ইহারও সে কোন সদুত্তর দিতে পারিল না। এবং কেন যে ছাদে আসিয়া শুইয়াছিল, এবং কেন যে তার চোখদুটা এত লাল হইয়া উঠিয়াছে, এসব প্রশ্নেরও উত্তর সে জননীকে দিতে পারিল না। কিন্তু নীচে আসিয়া আর্শিতে নিজের মুখ দেখিয়া সে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। সত্যিই ত তাহার চোখদুটা অত্যন্ত লাল! তাহার মনে হইল, সারারাত্রি ধরিয়া সে যেন মদ খাইয়াছে, নেশা যেন এখনও ছোটে নাই!

কি একটা কাজে তাড়াতাড়ি সে স্নানাহার সাঙ্গ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল ; তখন যে বস্তুটী তাহার সম্মুখে পড়িল, তাহা তাহাকে কিছুক্ষণের জন্য গভীর বিস্ময়ে নিমজ্জিত করিল। ইহা সত্য, না তাহার নিদ্রাবিহীন রজনীর খেয়াল, ইহা সে হঠাৎ স্থির করিতে পারিল না। গাড়ীর আওয়াজে যখন সে বুঝিল, ইহা সত্য—সত্যই গত রাত্রির সেই মামার ভগ্নীটীই স্কুলের গাড়ীর প্রথম আরোহী হইয়া বসিয়া রহিয়াছে, তখন বিহ্বলের মত সে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল, এবং কখন যে গাড়ীখানা তাহার দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল, ইহা সে এতটুকু জানিতে পারিল না। খানিকক্ষণ পরে নিজের অবস্থাটা বুঝিতে পারিয়া মনে মনে সে অত্যন্ত লজ্জাবোধ করিল, এবং এই ছোট্ট মেয়েটা যে এত শীঘ্র তাহাকে এমনি অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে, ইহার জন্য নিজেকে সে বারংবার তিরস্কার করিতে লাগিল। কিন্তু বিশ্বের চিরন্তন নিয়মে যে বস্তুটী তাহার মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে সে যখন তাহার কোন তিরস্কারকে গ্রাহ্য করিল না,

তখন তাহারই বশ্যতা স্বীকার করা ব্যতীত তাহার আব অন্য কোন উপায় রহিল না। তাই গাড়ীর আওয়াজে প্রতিদিনই সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়, প্রতিদিনই ইহার কদর্য্য দিকটা তাহার শিক্ষিত হৃদয়কে সঙ্কুচিত করিয়া তোলে, কিন্তু ইহা হইতে মুক্তির কোন উপায়ই সে খুঁজিয়া পায় না।

এম্‌নি করিয়া প্রায় ছ'মাস কাটিয়া গেল।

## দুই

পূজার ছুটীর আর বিলম্ব নাই। গাড়ীর অসম্ভব ভীড় কল্পনা করিয়া নির্ম্মলের পিতা প্রিয়নাথ বাবু পূর্ব্ব হইতেই সকলকে লইয়া শিমুলতলা যাত্রা করিলেন। নির্ম্মলের কলেজ তখনও বন্ধ হয় নাই, সেইজন্য সে-ই শুধু কলিকাতায় রহিল। সকলকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া, নির্ম্মল যখন সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া আসিল, তখন পিতা-মাতা-ভ্রাতা-ভগ্নী-শূন্য এই গৃহখানি তাহার নিকট যে নির্জ্জনতার সৃষ্টি করিল, তাহা তাহার সমস্ত চিত্তকে যেন অজস্র অশান্তিতে পূর্ণ করিয়া তুলিল। ইহার উপর কয়েক দিন হইল, তাহার ঈপ্সিত বস্তুটীর সন্ধান মিলে নাই, এবং পূজার অবকাশ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত যে, আর তাহার মানসপ্রতিমার সাক্ষাৎ মিলিবে না, ইহা বুঝিতেও তাহার বিলম্ব হইল না। কিন্তু এই না-দেখার বেদনা লইয়া এতগুলা দিন যে তাহার কেমন করিয়া কাটিবে, ইহার সে কোন ধারণাই করিতে পারিল না। তা' ছাড়া আজ আর একটা দিক তাহার চোখে পড়িল, সেটা এই যে, একদিন না একদিন যখন ঐ মেয়েটীর লেখাপড়া সাঙ্গ

হইয়া যাইবে তখন ত আর সে তাহার দেখা পাইবে না!—তখন কেমন করিয়া সে তাহার এই অদম্য লোভকে ত্যাগ করিয়া তাহার ভারাক্রান্ত দিনগুলি অতিবাহিত করিবে! এম্‌নি নানান্ চিন্তায় তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে যেন বিপ্লব বাধিয়া গেল, এবং ভয়ার্ত্ত শিশুর মত কত কি সে উচ্চারণ করিতে লাগিল যাহা অসংলগ্ন ও অর্থহীন।

পাচক আসিয়া কহিল, বাবু, খাবার কি দেব ?

নির্ম্মলের চমক ভাঙ্গিল। কোন কিছু না বলিয়া সে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

কলেজের ছুটি হইয়াছে, অথচ নির্ম্মল এখনও শিমুলতলায় আসিল না দেখিয়া, প্রিয়বাবু তাহাকে পত্র লিখিলেন। একটা কাজের অজুহাত দেখাইয়া নির্ম্মল পিতাকে লিখিয়া দিল যে, শিমুলতলায় যাইতে তাহার আরও কয়েকদিন বিলম্ব হইবে। পত্র পাইয়া প্রিয়বাবু 'তার' করিয়া জানাইলেন যে, কোনও কারণে এখন আর তাহার কলিকাতায় থাকা চলিবে না, টেলিগ্রাম্ পাইয়াই সে যেন কলিকাতা ত্যাগ করে।

টেলিগ্রামখানি নির্ম্মল ভাল করিয়া পাঠ করিল, এবং কেন যে পিতা তাহাকে এত জরুরি 'তার' করিয়াছেন তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

সন্ধ্যার সময় একটা ব্যাগ্ হাতে লইয়া নির্ম্মল নীচে নামিয়া আসিল, কিন্তু তাহার অন্তরাত্মা যেন বার বার তাহাকে বলিতে লাগিল, কাজ নাই, কাজ নাই—এখানে থাকিয়া যাও—হয় ত একদিন দেখা মিলিবে।

তাহা হইল না। ড্রাইভারকে জোরে গাড়ী চালাইতে হুকুম করিয়া সে গাড়ীর মধ্যে উঠিয়া বসিল।

'বহুত আচ্ছা, বাবুজী', বলিয়া শিখ ড্রাইভার তাহার মোটা ভারি গাড়ীখানা ষ্টেশনাভিমুখে দ্রুত চালাইয়া দিল।

গাড়ী ছাড়িতে আর অধিক সময় নাই, নির্ম্মল কোনরকমে একখানা সেকেণ্ডক্লাসের টিকিট কিনিয়া লইয়া গাড়ীতে উঠিল।

এস এস, বলিয়া তাহার কলেজের বন্ধু সুরেশ গাড়ীর ভিতর হইতে তাহাকে অভ্যর্থনা করিল।

নির্ম্মল অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, কোথায় যাচ্ছ সুরেশ?

যেখানে দু'চক্ষু যায়।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ, উপস্থিত কাশীতে, তারপর সকল তীর্থের সার এলাহাবাদে গিয়ে উঠ্‌ব, বলিয়া সে হাসিয়া উঠিল।

ওঃ—তা' বটে, ছুটিটা কাট্‌বে ভাল। তা' পূজোর সময় কল্‌কাতায় না থেকে তোমার বীণা এলাহাবাদে কেন?

তবে আর কলিকাল বলেছে কেন! আগেকার সব মেয়েদের স্বামীভক্তির কথাই শোনা গেছে, এখন আর সেদিন নেই—এখন পিতৃভক্তির 'এজ্‌' এসেছে। সেই যে দু'মাস আগে বাপের একটু শরীর খারাপ হ'তে তিনি স্বামী ত্যাগ করেছেন—সেই থেকে ব্যাস্, আর দেখাটী পর্য্যন্ত নেই। মনে করেছিলুম, আমিও ডুব মেরে দেব, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তা' পার্‌লুম না, কাজেই কল্‌কাতা ত্যাগ কর্‌তে বাধ্য হ'লুম। কিন্তু এ ত হ'লো আমার নিজের কথা, এখন তুমি কোথায় যাচ্ছ বল ত?

# স্বামীর বুকে

এইটেই পড়ে দেখনা, বলিয়া সে তাহাকে পকেট হইতে টেলিগ্রামখানা বাহির করিয়া দিল।

হুঁ! কিন্তু সেদিন বল্‌লে যে শিমুলতলায় এখন যাবে না?

বলেছিলেম বটে, কিন্তু ভেবে দেখ্‌লুম, না গেলে বাবা অত্যন্ত দুঃখিত হবেন।

তবু ভাল! আমি মনে করেছিলুম, এবার বুঝি সেই মামার ভাগ্নীটীকে নিয়ে ছুটীতে একটু দারজিলিংএ হাওয়া খেতে যাবে।

তোমার এরূপ মনে করার জন্য তোমায় ধন্যবাদ! কিন্তু চিন্তাশক্তি আছে ব'লেই, সকল সময় যা-তা চিন্তা কর্‌লে, সে শক্তির অপব্যয়ও বড় কম হয় না ভাই! তুমি বেশ জান যে, আজ পর্য্যন্ত তাঁকে দেখা ছাড়া একটা মুখের কথা পর্য্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমার হয়নি। তা' ছাড়া, আমাকে তিনি বোধ হয় আদৌ চেনেনই না।

আশ্চর্য্যের ভাণ করিয়া সুরেশ কহিল, বল কি! শুধু দেখাতেই যদি তোমার এই অবস্থা করে থাকেন, কথা হ'লে না জানি কি হ'তো! পরে, হঠাৎ গম্ভীর হইয়া কহিল, যাকে জাননা—শোননা, যার নামটা পর্য্যন্ত তোমার জানা নেই, তারই জন্যে দুঃখ করে যে কি সার্থকতা তা' আমি বুঝতে পারি না। আমার মনে হয়, সেণ্টিমেণ্ট বস্তুটা বাজে হ'লেও সেটা এতটা সস্তা নয়।

নির্ম্মল কোন উত্তর করিল না; শুধু বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া, সে যেন একটা মহাদুঃখকে নীরবে চাপিয়া ফেলিল।

কিছুক্ষণ পরে সে অতি শান্তভাবে কহিল, এবার ছুটীটা কতদিন হ'লো বল ত ?

মাস দুই হবে, বলিয়া সুরেশ তেম্‌নি চুপ করিয়া রহিল।

গাড়ীর গতি মন্দ হইতে মন্দতর হইয়া একটা বড় ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। নির্ম্মল কহিল, একটু চা হ'লে মন্দ হ'তো না, কি বল সুরেশ ?

সুরেশের এ বিষয়ে মতভেদ ছিল না; তাই দুই বন্ধুতে চায়ের উদ্দেশে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল।

তারপর, বাকি রাতটুকু এক প্রকার নিদ্রা ও জাগরণের মধ্য দিয়া কাটিয়া ভোরের দিকে গাড়ী যখন শিমুলতলায় আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন সুরেশ কুণ্ঠিতভাবে কহিল, আজ আমাদের দেখা না হ'লেই ভাল হ'তো।

কেন ?

তাহ'লে মিছামিছি আর তোমাকে আমার কথায় দুঃখ পেতে হ'তো না। কিন্তু সত্যি বল্‌চি, তোমাকে দুঃখ দেওয়া আমার মোটেই উদ্দেশ্য ছিল না, বরং—

নির্ম্মল বাধা দিয়া কহিল, আচ্ছা, তোমার আর 'এপোলজি চাইতে হবে না, কিন্তু বৌদি'কে আমার নমস্কারটা জানাতে যেন ভুলো না।

দিন দুই পরে দিবানিদ্রা হইতে নির্ম্মল সবেমাত্র জাগিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় তাহার জননী যেন দম্‌কা হাওয়ার মত ঘরে ঢুকিয়া কহিলেন, হাঁরে নির্ম্মল, তুই আমাদের রেবাকে চিনিস্ ?

নির্ম্মল একটু হতভম্ব হইয়া গেল; 'আমাদের' বলিয়া জননী যাহাকে সম্বোধন করিলেন, তাহাকে চেনা দূরে থাক্, তার নামটা পর্য্যন্ত ইহার পূর্ব্বে সে যে কোথাও শুনিয়াছে বলিয়া ধারণা করিতে পারিল না; অগত্যা, একটী ছোট্ট 'না' বলিয়া সে মাতার প্রশ্নের জবাব দিল।

যে উৎসাহ ও আনন্দ পোষণ করিয়া জননী পুত্রের ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহা আর স্থায়ী হইতে পারিল না। তবুও তিনি পুনরায় কহিলেন, কিন্তু সেদিন তোকে বাড়ীতে আস্‌তে দেখে শিবুকে সে যে জিজ্ঞাসা কর্‌ছিল, শিবু, ইনিই বুঝি তোমার দাদা? আমি যে নিজের কাণে তা' শুনেছি।

নির্ম্মল অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, কি জানি মা, কে তোমাদের রেবা, এবং কেনই বা তিনি আমার কথা শিবুকে জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলেন? তা' ইনি থাকেন কোথায়?

ঠিক আমাদের পাশের বাড়ীতেই। সত্যি বল্‌চি নির্ম্মল, এমন মেয়ে আমি কখন দে'খিনি। এই ক'দিনের ত পরিচয়, কিন্তু এর মধ্যেই সে আমার অনেকখানি মন কেড়ে নিয়েছে।

নির্ম্মল বুঝিল, এই মেয়েটী যিনিই হউন, তাহার সহিত মায়ের বেশ পরিচয় হইয়াছে, এবং সেই কারণে তাহার আসার কথাটাও তিনি শুনিয়া থাকিবেন। বলিল, তিনি আমাকে চেনেন, এ খবর তুমি পেলে কোথা থেকে? এমন ত হ'তে পারে যে, আমার আসার কথাটা তিনি আগে থেকে তোমার কাছে শুনেছিলেন, আমাকে দেখে সেই কথাটাই শিবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন?

তা' হয় ত হবে, বলিয়া জননী চুপ করিলেন। কিন্তু যে কথাটা তাঁর অন্তরের মধ্যে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিল তাহাকে আর তিনি চাপা দিতে পারিলেন না। কহিলেন, একে দেখে পর্য্যন্ত আমার কি মনে হয়েছে জানিস্ ?

কি ?

জননী প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিলেন, তারপর এক রকম জোর করিয়াই কহিলেন, আমার বড় সাধ, একেই আমার বৌ করি।

কিন্তু, মা, পড়াশুনা শেষ না করে ত আমি বিবাহ ক'র্‌ব না।

পুত্রের এই কঠিন কথায় তাঁহার চোখ দু'টী জলে ভরিয়া গেল। এবং এমনিটাই যে হইবে, ইহাও তিনি যেন জানিতেন কিন্তু কেন যে নির্ম্মল প্রতিবারেই তাঁহাকে এ সম্বন্ধে আঘাত করিতে এতটুকুও দ্বিধা করে নাই, শুধু এই তথ্যটাই আজ পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট একটা রহস্য বলিয়া বোধ হইত।

বৈকালে একটা মোটা ছড়ি লইয়া নির্ম্মল বেড়াইতে বাহির হইল। তাহার বাড়ী হইতে যে পথটা সোজা পশ্চিম দিকে চলিয়া গিয়াছে, সেইটা ধরিয়া সে পথ চলিতে লাগিল। পথে কত ভ্রাম্যমাণ বাঙ্গালীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল, কিন্তু পরিচয়ের অভাবে কাহারও সহিত কোন কথাবার্ত্তা হইল না। তবে, তাঁহারাও যে সকলে তাহারই মত প্রবাসী, পূজার ছুটী উপলক্ষে একটু হাওয়া খাইতে আসিয়া এই দেশের অধিবাসীদের অযথা বিব্রত করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের পোষাক-পরিচ্ছদ কথাবার্ত্তা হইতে

বেশ বুঝা গেল। খানিকটা ঘুরিয়া ফিরিয়া একটা ছোট্ট পাহাড়ের তলায় আসিয়া সে উপবেশন করিল।

তখন সন্ধ্যা হয় হয়; স্বাস্থ্য অন্বেষণকারীরাও প্রায় সকলেই স্ব স্ব আবাসে ফিরিয়া গিয়াছে; প্রকৃতির এই অতি নির্জ্জন কোণে আসিয়া সুরেশের কথাগুলো হঠাৎ তাহার মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিল। যতই সে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিল, ততই সে বুঝিতে পারিল, সুরেশ ত মিথ্যা বলে নাই! সে ত ঠিকই বলিয়াছে! যাহাকে জানিনা শুনিনা, যাগার নামটী পর্য্যন্ত জানি না, তাহার জন্য অকারণে এত বড় দুঃখ সহিব কেন? মিথ্যাই এতদিন আমি দুঃখ ভোগ করিতেছি!—আর না!—এম্‌নি কত কথা বলিয়া সে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। কিন্তু যে দুষ্ট দেবতা অনন্তকাল ধরিয়া নর-নারীর এই ব্যথা লইয়া খেলা করিয়া বেড়ান্, তিনি নিশ্চয় মনে মনে না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না।

রাত্রি গভীর হইয়াছে, নিস্তব্ধতার বুক চিরিয়া একটা অশ্রান্ত ঝঙ্কার যেন সারা ধরিত্রীকে মুগ্ধ করিয়া দিয়াছে। এম্‌নি সময় নির্ম্মল তার মোটা ছড়িটা লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এবং ধীরে ধীরে এই অন্ধকারাচ্ছন্ন বন্ধুর পথ অতিক্রম করিয়া যখন সে বাড়ীর সন্নিকটে আসিল, তখন দূর হইতে দেখিতে পাইল, কতগুলা লোক লণ্ঠন লইয়া তাহার ফটকের সম্মুখে অত্যন্ত ব্যস্ততা প্রকাশ করিতেছে। কৌতূহলবশতঃ যখন সে তাড়াতাড়ি বাড়ী আসিয়া পৌছিল, তখন সকলের সমবেত প্রশ্নের কলরবে তাহার অবস্থা কতকটা সে উপলব্ধি করিতে পারিল। তাহার ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া যে এই বিপুল-বাহিনী তাহারই অন্বেষণে সজ্জিত হইয়াছিল, ইহা বুঝিতে তাহার

বিলম্ব হইল না। কিন্তু চক্ষু কর্ণ সজাগ করিয়া যতই সে তাহার ভগ্নীর পার্শ্বের ঐ মেয়েটীকে চিনিতে চেষ্টা করিল, ততই তাহার দৃষ্টিশক্তি যেন হ্রাস হইয়া আসিল এবং এত বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার যে, কোনদিন সংসারে অনুষ্ঠিত হইতে পারে, ইহা সে কল্পনা করিতেই পারিল না।

## তিন

ঘুম ভাঙিলে নির্ম্মল পূবের জানালাটা খুলিয়া দিল। এবং উষার যে তরুণ আলো তাহার জানালার পিছনে সৌন্দর্য্যের জাল টানিয়া দিতেছিল, তাহারই দিকে চাহিয়া তাহার সমস্ত চিত্ত যেন পুলকে মাতোয়ারা হইয়া·উঠিল। বহুদিন হইতে যে বেদনা তাহার সমস্ত জীবনকে ভারি করিয়া তুলিয়াছিল, আজ তাহার কোন চিহ্ন রহিল না। এম্‌নি শান্ত বেদনা-বিহীন জীবন সে অনেক দিন উপভোগ করে নাই, তাই আজিকার এই প্রভাতকে সে যেন আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহিল, এবং ইহার গাছ-পালা, আকাশ-বাতাস কোনটাকেই সে আজ অবহেলা করিতে পারিল না!

এই নূতন চিন্তা তাহাকে এম্‌নিই মাতাইয়া তুলিয়াছিল যে, কখন যে শিবু আসিয়া চা দিয়া গিয়াছিল—কখন যে তাহার জননী আসিয়া তাহাকে উন্মনা দেখিয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন, ইহার কোনটাই সে লক্ষ্য করে নাই। চা খাওয়া সাঙ্গ করিয়া শিবুকে সে ডাকিয়া পাঠাইল। এই ভাইটীকে নিত্য সে নিজেই পড়াইত, তাই ভ্রাতার আহ্বানে শিবু বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। ছুটীর দিনেও

যে তাহার না পড়িয়া উপায় নাই, ইহার জন্য মনে মনে সে দাদার উপর অত্যন্ত রাগ করিল ; কিন্তু তাহার আহ্বান উপেক্ষা করিবার তাহার সাহস হইল না। কাজেই, কতগুলা বই হাতে করিয়া মুখখানা অত্যধিক গম্ভীর করিয়া শিবু দাদার ঘরে প্রবেশ করিল। নির্ম্মল হাসিয়া কহিল, বই কি হবে রে ?—এখন যে তোর ছুটী। কথা শুনিয়া শিবু বড় খুসী হইল এবং আহ্লাদে কি যে করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না ; আনন্দের আতিশয্যে সে কহিল, তোমার হারমোনিয়মটা নিয়ে আস্‌ব দাদা ?

হারমোনিয়ম ? কোথা থেকে রে ?

শিবু হতবুদ্ধি হইয়া গেল ; আনন্দের নেশায় সে যাহা বলিয়া ফেলিয়াছে তাহা ত বলা উচিত হয় নাই ! পুরস্কারের লোভে, দাদার অনুমতি না লইয়াই বাজ্‌নাটা কাল সে তাহার রেবাদিদিকে দিয়াছিল, এবং দাদা যে তাহার এত বড় অপরাধকে কিছুতেই ক্ষমা করিবে না—ছুটীর এই আনন্দের দিনেও যে তাহার ভাগ্যে অন্ততঃ দুটি কাণমোলা সুনিশ্চিত, ইহা ভাবিয়া তাহার মনটা বড় অপ্রসন্ন হইয়া গেল। সে ক্ষমাপ্রার্থীর মত কুণ্ঠিতভাবে দাদার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। নির্ম্মল পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, বাজ্‌নাটা কোথায় আছে রে ? এইবার সে কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদ্‌চিস্ কেন ? বলিয়া পরমস্নেহে নির্ম্মল ভ্রাতাকে নিজের নিকট টানিয়া লইল। কতকটা সাহস সংগ্রহ করিয়া শিবু কহিল, রেবাদি' যে কাল সেটা চাইলে তাই ত আমি দিলুম ; কিন্তু তাহার পুরস্কারের কথাটা দাদাকে বলিতে তাহার ভরসা হইল না। তোর রেবাদি' বুঝি সেটা চেয়েছিলেন ? হাঁরে বোকা, তাতে কি হয়েছে ? বেশ ত,

তুই যেন সেটা চাইতে যাস্‌নি—বলিয়া তাহার এই গম্ভীর দাদাটী তাহার সহিত যে কাণ্ডটী বাধাইয়া দিল, ইহা যে কেমন করিয়া সম্ভব হইল, এইটা সে কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। দাদার আচরণে তাহার সাহস বাড়িয়া গেল। কহিল, রেবাদি' বলে, আমি তোমার দাদাকে চিনি শিবু। সত্যি দাদা? বলিয়া বিস্ময়ের সহিত সে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। নির্ম্মল আগ্রহের সহিত কহিল, তিনি আর কি তোকে বলেছেন শিবু?

আর যে তাহার সহিত কি কথা হইয়াছে তাহা সে স্মরণ করিতে পারিল না তবে তিনি যে তাদের কল্‌কাতার বাড়ীটা জানেন, এই খবরটাই সে দাদাকে জানাইয়া দিল। নির্ম্মল আর একবার ভাইকে আদর করিয়া কহিল, আচ্ছা, তুই যা। কিন্তু দাদা কেন যে তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন, ইহাই প্রশ্ন করিতে গিয়া দেখিল, তাহার রেবাদি' তাহাকেই হাত নাড়িয়া ডাকিতেছেন। বাহিরে যাইবার তাহার আর ধৈর্য্য রহিল না, ঘর হইতে সে চীৎকার করিয়া কহিল, দাদা, এই যে রেবাদি' এসেছেন, ডাক্‌ব এখানে? নির্ম্মল তাড়াতাড়ি একখানা বই তুলিয়া লইল। আগন্তুক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল, আপনি কি আমায় ডাক্‌ছিলেন?

নির্ম্মল বই হইতে মুখ তুলিয়া কহিল, আসুন। আপনারা বুঝি পাশের বাড়ীটাতেই আছেন? কতদিন আপনারা এখানে থাক্‌বেন?

রেবা সাম্‌নের চেয়ারটাতে বসিয়া কহিল, প্রায় মাস দেড়েক

হবে। মামার শরীরটা ভাল নেই, তাই এখানে আসা—একটু সার্‌লেই আমরা কল্‌কাতা চলে যাব।

নির্ম্মল লজ্জিতভাবে কহিল, দেখুন, আপনাকে বস্‌তে না বলার জন্য আমি অত্যন্ত লজ্জিত—অন্য কোন সমাজের হ'লে তিনি আমার সঙ্গে হয় ত কথাই কইতেন না।

রেবা হাসিয়া কহিল, আমরা যখন কেহই সে সমাজের নই, তখন আর আপনার দুশ্চিন্তার কারণ কি? তা' ছাড়া, লজ্জা ত আমারই হওয়া উচিত নির্ম্মলবাবু! সেদিন অকারণে আপনাকে সহসা আঘাত করেও যখন কিছুতেই আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে পারলেম না, তখন আপনি কি মনে করেছিলেন বলুন ত?

নির্ম্মল বুঝিল রেবা সেই থিয়েটারের ঘটনাটী ইঙ্গিত করিতেছে। সে কহিল, সে ত আর আপনি ইচ্ছে করে করেন্‌নি—ও ত 'এক্‌সিডেণ্ট্‌'।

রেবা ইহার কোন উত্তর দিল না, নিজের মনেই কহিল, তারপর যতবার আপনাকে দেখেছি কিছুতেই আর আপনার দিকে যেন তাকাতে পারিনি! আচ্ছা নির্ম্মলবাবু, ঐটেই বুঝি আপনাদের কল্‌কাতার বাড়ী?

একটী ছোট্ট 'হুঁ' বলিয়া নির্ম্মল তাহার প্রশ্নের জবাব দিল, এবং তাহার দুর্ব্বলতা যে এই মেয়েটীর নিকট ধরা পড়িয়া গিয়াছে, ইহার জন্য সে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

শিবু এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল, এবং সত্যই যে তাহার রেবাদি'র সঙ্গে তাহার দাদার পরিচয় আছে, ইহা সে কতকটা অনুমান করিতে পারিল। কিন্তু কোথায়—কেমন করিয়া যে ইহা

ঘটিয়াছে, ইহাই চিন্তা করিতে করিতে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রেবা তাহাকে ডাকিয়া কহিল, ও শিবু, কালকের সেই ছবির বইটা নিয়ে যাও।

বাহির হইতে শিবু কহিল, সে আমি চাই না।

তারপর নির্ম্মলকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, কাল্‌কে এইটের লোভেই শিবু আমাকে আপনার হারমোনিয়মটা ছেড়ে দিয়েছিল। আপনাকে না বলে ওটা নিয়ে যাওয়াতে আপনার ত কোন অসুবিধা হয়নি ?

কিছু না। ওটা বোঝার মতই খালি বয়ে বেড়াই, শেখ্‌বার কত চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারিনি—এম্‌নি অক্ষম আমি !

সেটা আপনার অক্ষমতা, না, চেষ্টার অভাব ? আপনি এত লেখাপড়া শিখেছেন আর এই সামান্য কাজটাতে ফেল্ হ'য়ে গেলেন ! আমার ত মনে হয়, এর জন্যে আপনাকে যথেষ্ট শাস্তি পাওয়া উচিত। ওঃ, আপনার ত বিবাহই হয়নি !

অর্থাৎ, আমার শাস্তি দেওয়ার লোক হয়নি, এই না ? তা' সে ভারটা কি আপনি গ্রহণ কর্‌তে পারেন না ? সত্যি বল্‌ছি, এ ভার আপনাকে ছাড়া আর কাউকে আমি দিতে পার্‌ব না। বলিতে বলিতে উত্তেজনায় তাহার চোখ দুটা যেন জ্বলিতে লাগিল, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে উঠিয়া দাড়াইয়া তাহার দুই হাত নিজের বক্ষে টানিয়া লইয়া বার বার বলিতে লাগিল, বল বল রেবা, আমার এ ভার তুমি নেবে ?

এ আপনি কি ছেলেমানুষী কর্‌চেন? ছেড়ে দিন্—কেউ হয় ত এখনি এসে পড়বে, বলিয়া জোর করিয়া সে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইল। এবং কোন রকমে গায়ের কাপড়টা গুছাইয়া লইয়া অভিভূতের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

প্রভাতের যে আনন্দ অনুভব করিয়া নির্ম্মলের চিত্ত তৃপ্তিতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, সে যে এম্‌নি করিয়া তাহাকে আবার অতৃপ্তির বহ্নিতে পুড়াইয়া ছারখার করিবে, কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহার কোন সংবাদই সে পায় নাই।—আগুন ধরিয়া গৃহখানি যখন পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইয়া গেল, তখনই বুঝিল এই শান্ত নিস্তব্ধ গৃহের মধ্যে বহুপূর্ব্ব হইতেই বহ্নি তাহার কার্য্য স্বরু করিয়াছিল, এখন সময় বুঝিয়া তাহা নিঃশেষ করিয়া দিল। তাহার বিক্ষিপ্ত চিত্ত যে এক নিমিষে শীলতার ও লজ্জা সরমের কোন কিছু আর অবশিষ্ট রাখিবে না, ইহা সে তাহার অতি বড় উন্মাদ মুহূর্ত্তেও কখন কল্পনা করে নাই। চিরদিনই সে তাহার অন্তরের ব্যথাকে নিজের মধ্যেই লুকাইতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কোন্ দুঃসাহসে সে যে আজ মাতিয়া উঠিয়া তাহাকে এই অপরিচিতার নিকট চিরদিনের মত এম্‌নি হেয় করিয়া দিল, ইহা চিন্তা করিয়া ক্ষোভে ও দুঃখে তাহার চোখ দুটা ফাটিয়া যেন জল আসিয়া পড়িল, এবং যত প্রকার কঠোরতার দ্বারা তাহার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা সম্ভব তাহার কোনটাই সে আজ যথেষ্ট মনে করিল না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, এইবার যখন ঐ মেয়েটী তাহাকে দেখিতে পাইবে, তখন নিশ্চয় সে মনে মনে হাসিয়া বলিবে, ওরে ভণ্ড, ময়ূরপুচ্ছ পরিয়া দাঁড়কাক কখন ময়ূর হয় না। নিজের

## স্বামীর বুকে

গৃহে অতিথির যে সম্মান রাখিতে পারে না, তাহার আবার ভদ্রলোক বলিয়া পরিচয় দিবার প্রয়াস কেন ?

বেলা তখন অধিক হইয়াছে ; নির্ম্মল তখনও নীচে নামিল না দেখিয়া তাহার জননী আসিয়া কহিলেন, হাঁরে, নাওয়া-খাওয়া কি ভুলে গেছিস্ ? তারপর, সন্তানের যে চেহারা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল তাহাতে তিনি ভয় পাইয়া গেলেন। তাহার মাথার চুল খাড়া হইয়া উঠিয়াছে ; চোখের কোল দুটায় কে যেন কালী লেপিয়া দিয়াছে ; মুখের উপর একটা গভীর হতাশার কালো ছায়া পড়িয়াছে। তিনি ভীতকণ্ঠে কহিলেন, কি হয়েছে বাবা নির্ম্মল ? এম্‌নি করে শুক্‌নো মুখে বসে আছিস কেন বাবা ! চুপ করে রইলি যে ? বল্ না, কি হয়েছে তোর ?

নির্ম্মল সহজভাবেই কহিল, কিছুই হয়নি মা, হঠাৎ মাথাটা বড় ধরেছে তাই একটু চুপ করে বসে আছি। এই বলিয়া হাতের কাপড়টা দিয়া সে মুখটা বেশ করিয়া মুছিয়া ফেলিল। কিন্তু মনুষ্যত্বের সবটুকু নিঃশেষ করিয়া যে কালিমা সে নিজ হাতে লেপিয়া দিয়াছে, তাহা যেন কিছুতেই মুছিতে পারিল না।

পুত্রের কথায় জননীর প্রত্যয় হইল না ; কিন্তু তবুও তাহাকে আর বেশী প্রশ্ন করিবার তাঁহার সাহস ছিল না।

পরদিন সকাল হইতেই বাড়ীময় কিসের একটু সাড়া পড়িয়া গেল ;—আজ বিজয়া-দশমী। এখানে আত্মীয়-স্বজন না থাকায় প্রবাসী বাঙ্গালীরা এ দিনটা পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিতে পারে না, কিন্তু তবুও এ দিনটীকে তাহারা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত দেখে। বিকেলবেলায় নির্ম্মলের জননী রান্নাঘরে বসিয়া বহুবিধ ভোজ্যদ্রব্য

স্বহস্তে প্রস্তুত করিতেছিলেন, এমন সময় নির্ম্মল আসিয়া কহিল, এত আয়োজন কিসের মা?

মা কহিলেন, আজ যে বিজয়া রে! একটু আধটু মিষ্টি মুখ ত করতে হবে।

খাদ্যদ্রব্যের দিকে চাহিয়া নির্ম্মল কহিল, তা' না হয় হবে। কিন্তু এত খাবার কে খাবে মা?

মা হাসিয়া কহিলেন, তোরাই খাবি—আবার কে খাবে! আর যদি রেবা ও তার মামী আসেন বেড়াতে। সুনীতি বাবুর শরীর ভাল নেই—তিনি এ সব কিছুই খান্ না।

নির্ম্মল আর কোন প্রশ্ন করিল না, নীরবে উপরে চলিয়া গেল। কিন্তু ঘরের মধ্যে গিয়া একটা কথা তাহার বার বার মনে হইতে লাগিল, ইহা কি সম্ভব! রেবা কি ঐ ঘটনার পর আর কোন দিন এ বাড়ীতে পদার্পন করিবে? মায়ের কথা মনে করিয়া তাহার হাসি আসিল; এবং তাঁহার এত পরিশ্রম যে সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যাইবে, এ সম্বন্ধে তাহার কোন সন্দেহই রহিল না।

সন্ধ্যার সময় নির্ম্মল হাত মুখ ধুইয়া উপরের ঘরে বসিয়া আছে, এমন সময় হঠাৎ যেন একটা সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ অকস্মাৎ তাহার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, রেবা! গভীর বিস্ময়ে বিপুল আনন্দে সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আপনি!

রেবা হঠাৎ তাহার পায়ের তলায় একটা প্রণাম করিয়া কহিল, আপনি যে বড় আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন! কিন্তু আজকের দিনে বড়দের যে এটা প্রাপ্য, সেটা আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন?

নির্ম্মল নিজেকে শক্ত করিয়া কহিল, আচ্ছা, এই পাপিষ্ঠকে স্পর্শ করতে আপনার ঘৃণা হ'লো না ?

সে শান্তভাবে কহিল, ঘৃণা কেন হবে, নির্ম্মল বাবু? এমন কি অপরাধ আপনি করেছেন ?

অপরাধ! অতিথিকে ঘরের মধ্যে পেয়ে যে তাঁর মর্য্যাদা রাখ্‌তে পারে না, তার অপরাধ কি সোজা! তারপর, অনুতপ্তস্বরে কহিল, কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত কেবল কি ভেবেছি জানেন? মৃত্যু! মৃত্যুই আমার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত!

দেখুন। আপনি অনর্থক এটাকে বাড়িয়ে তুলেচেন। যাতে আপনার কোন হাত নেই, তার জন্যে যে আপনি কেন মিছে কষ্ট পান, তা আমি বুঝ্‌তে পার্‌চি না।

নির্ম্মল উত্তেজিত হইয়া কহিল, বলেন্ কি? সত্যি আমার কোন দোষ নেই ?

সত্যই, এতে আপনার কোন দোষ নেই। তারপর, নির্ম্মলের অতি সন্নিকটে আসিয়া কহিল, সেদিন অতিথি যদি স্বেচ্ছায় ধরা না দিতেন, তাহলে আপনি কি তাঁকে অপমান কর্‌তে পার্‌তেন? বলিয়াই বিদ্যুদ্বেগে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মন্ত্রমুগ্ধের মত নির্ম্মল সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর যতদূর দৃষ্টি যায়, সে তাহার দুই চক্ষু দিয়া এই নারীর আজিকার ঐ সৌন্দর্য্যটুকু যেন গিলিয়া খাইতে লাগিল।

কাজ-কর্ম্ম সারিয়া নির্ম্মলের জননী ঘরে আসিয়া স্বামীকে কহিলেন, দিন-রাত্রি তামাক নিয়ে থাক্‌লেই কি ছেলের বিয়ে হ'য়ে যাবে? এমন সৃষ্টিছাড়া মানুষ কিন্তু আমি কোথাও দেখিনি!

প্রিয়বাবু তখন সবেমাত্র তাঁহার মুখের ধোঁয়াটা ছাড়িয়াছেন; গৃহিণীর কথায় তাকিয়াটা একটু টানিয়া লইয়া কহিলেন, তোমার ছেলে যদি বিয়ে ক'রব না বলে প্রতিজ্ঞা করে থাকে, তাহলে মিথ্যা চেষ্টা করে লাভ কি?

গৃহিণী হাসিয়া কহিলেন, না গো না, আর তোমায় মিথ্যা চেষ্টা করতে হবে না,—নির্ম্মল আমার বিয়ে ক'রবে।

প্রিয়বাবু কহিলেন, কি করে জান্‌লে?

গৃহিণী তেমনি হাসিয়া কহিলেন, সে আমি জানি। তা' নিয়ে তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না। কিন্তু সুনীতিবাবুর ঐ ভাগ্নীটী ছাড়া সে অন্য কাউকে বিয়ে ক'রবে না বলে দিচ্ছি। যেমন করেই হোক্, এটা তোমায় পাকা করতেই হবে।

তিনি গম্ভীর হইয়া কহিলেন, কথা কয়ে দেখ্‌ব—নিশ্চয় কিছু বলা যায় না।

দিনকতক পরে তিনি স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, আজ সুনীতিবাবুর কাছে বিয়ের কথাটা উত্থাপন করেছিলুম; তিনি বল্‌লেন, কল্‌কাতায় গিয়ে এ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে কথা কইব—এখন কিছু বলতে পারছি না।

কথাটা শুনিয়া নির্ম্মলের জননী বিশেষ উল্লাস প্রকাশ করিলেন না।

# চার

ওগো শুন্‌চ ?

কি ? বলিয়া নির্ম্মলের জননী স্বামীর আহ্বানে সাড়া দিলেন।

আজ আমি স্থনীতিবাবুর বাড়ী গেছ্‌লুম।

তাঁরা ফিরেছেন না কি ?

হাঁ। আমাদের আসার দিন পনের পরেই তাঁরা ফিরেছেন। বিবাহ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হ'লো। যা বুঝ্‌লুম, তাতে নির্ম্মলের সঙ্গে তাঁর ভাগ্নীর বিবাহ হওয়ার এতটুকুও সম্ভাবনা নেই! তিনি একটী পাত্র পেয়েছেন, ছেলেটী ডাক্তার—বাপ বড় উকিল; কল্‌কাতায় প্রকাণ্ড বাড়ী—টাকাকড়িও যথেষ্ট আছে। এ ছেড়ে তিনি আমাদের বাড়ী মেয়ে দিতে রাজী হবেন কেন ?

গৃহিণী কহিলেন, আমার নির্ম্মলও ত এম-এ পড়ছে—সেও ত আমার মূর্খ ছেলে নয়! তা' ছাড়া তার স্বভাব-চরিত্র এ পাড়ার কে না জানে ?

প্রিয়বাবু হাসিয়া কহিলেন, আমি কি তোমার ছেলের চ'য়ে ওকালতি কর্‌তে কসুর করেছি ? কিন্তু টাকাটাই যে এ সংসারে বড় জিনিষ গৃহিণী!

রাগের মাথায় গৃহিণী কহিলেন, টাকা? কেন, আমরাই কি পথে দাঁড়িয়েছি না কি?

প্রিয়বাবু আর একবার হাসিলেন; এ হাসি, দুঃখের কি আনন্দের, ঠিক বুঝা গেল না।

নির্ম্মলের পরীক্ষার আর বিলম্ব নাই। একটা নূতন উৎসাহ ও উদ্যম লইয়া ইহারই জন্য সে দিবারাত্র পরিশ্রম করিতেছিল। হঠাৎ এ দুঃসংবাদে সে তাহার মাথাটা ফাটাইয়া ফেলিবে, কি, হাতে হাতে এই অভিশপ্ত জীবনের পালাটা শেষ করিয়া দিবে, কিছুই যেন স্থির করিতে পারিল না। আজ এক নিমিষে তাহার নিকট ঘর-সংসার, লেখাপড়া এমনি তুচ্ছ হইয়া গেল যে, আপনার বলিতে এ সংসারে তাহার কোথাও যেন কিছু আর অবশিষ্ট রহিল না। শুধু একটা আর্ত্তনাদ অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় তাহার বুকের ভিতর হইতে ফাটিয়া বাহির হইবার ব্যর্থ চেষ্টায় আছাড়-পাছাড় খাইতে লাগিল।

সেদিন নির্ম্মল খাইতে বসিয়াছিল, জননী ভয়ে ভয়ে কহিলেন, বাবা নির্ম্মল, মায়ের এ সাধটা কি তুই পূর্ণ ক'র্বি না? শ্যাম-বাজারের এ মেয়েটীও ত বেশ সুন্দরী বাবা!

নির্ম্মলের হাতের ভাত হাতেই রহিল; সে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া কহিল, আমার মরণ হ'লেই কি তোমরা বাঁচ?

বালাই! ষাট! পুত্রের কথায় জননীর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। তিনি কত বলিলেন, কিন্তু নির্ম্মল আর কিছুতেই খাইতে বসিল না।

জীবনের যে দুর্দ্দশায় পৌছিলে মানুষ আর ভাল করিয়া এ

# স্বামীর বুকে

পৃথিবীটার দিকে চাহিয়া দেখিতে পারে না—সমস্তটাই যেন কি রকম ঘোলা হইয়া যায়; নির্ম্মলও ঠিক সেই অবস্থায় পৌঁছিয়াছিল। এখানে মায়া নাই, দয়া নাই, আশা নাই—আছে কেবল বিরাট নৈরাশ্য, আর তীব্র অনুশোচনা!

রাত্রি প্রায় বারোটা। বাহিরে টিপ্ টিপ্ করিয়া জল পড়িতেছিল। সুরেশ নীচের ঘরে বসিয়া তাহার আসন্ন বিপদ হইতে মুক্তিলাভের জন্য একাগ্রচিত্তে 'ফিলজফি' পড়িতেছিল। হঠাৎ গাড়ীর আওয়াজে চাহিয়া দেখিল, নির্ম্মল। এত রাত্রে তাহাকে দেখিয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, ব্যাপার কি নির্ম্মল? কিন্তু ইহার বেশী সে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না; তীব্র সুরার গন্ধে তাহার যেন বমি হইবার উপক্রম হইল। মুখটা ফিরাইয়া সে কহিল, আগে ত এ সব খেতে না!

না! আগে এর প্রয়োজন হয়নি!

কবে থেকে তবে সুরু করলে?

এ জিনিষ কি কেউ দিন-ক্ষণ দেখে সুরু করে সুরেশ, যেদিন এর প্রয়োজন হয়, সেদিন আর মুহূর্ত্তেরও বিলম্ব সয় না। এম্‌নি অসময়ে এসে তোমার বড় ক্ষতি করলুম, নয়?

সুরেশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, পরে কহিল, অপরের ক্ষতি বোঝ্‌বার যার শক্তি আছে, সে যে নিজের ক্ষতির পরিমাণটা বুঝতে পারছে না কেন, এইটেই আজ আমায় বড় আশ্চর্য্য করে দিয়েছে নির্ম্মল!

কথা শুনিয়া নির্ম্মল হাসিল; এ হাসি সুরেশ চিনিল। কিন্তু বেদনা যত বড়ই হউক তাহাকে এম্‌নি করিয়া প্রশ্রয় দেওয়া সে

উচিত মনে করিল না। কহিল, আমি তোমায় উপদেশ দিচ্ছি না ভাই, কিন্তু এর পরিণামটা একবার ভেবে দেখেছ ?

পরিণাম ? সেটা ভাব্‌বার আর সময় পেলুম কোথায় ভাই ? একেবারে এক মুহূর্ত্তে সব গুলিয়ে ঘোলা হ'য়ে গেল যে ! কিছুই কি আর দেখ্‌তে দিলে ! আচ্ছা সুরেশ, জ্বলন্ত আগুনে কখন মানুষকে পুড়্‌তে দেখেচ ? দেখনি, নয় ? কিন্তু আমি দেখেছি—উঃ, কি সে যন্ত্রণা !

সুরেশ আর সহ্য করিতে পারিল না। কহিল, সুখী হও সংসারে আর কি এমন কিছু নেই ?

নির্ম্মল পকেট হইতে মদের শিশিটা বার করিয়া কহিল, আছে বৈকি ! এই যে !

দুঃখে ও ক্ষোভে সুরেশের কণ্ঠস্বর ভারি হইয়া উঠিল। সে কহিল, নির্ম্মল, ছেলেবেলার না হ'লেও, বন্ধুত্বটা আমাদের বড় কম দিনের নয় ! সুখ দুঃখের কোন কিছু থেকেই তুমি আমায় বাদ দাওনি ! আজ একটা কথা তোমার হাতে ধরে আমি অনুরোধ ক'র্‌চি, এ বিষ খেয়োনা। কোনদিন কোন হতভাগাই এ থেকে সুখ পায়নি !

নির্ম্মল কহিল, উপায়ও ত কিছু নেই সুরেশ ! আজ আমার কি মনে হ'চ্চে জান ? মনে হ'চ্চে, যাদের মরা উচিত, অথচ যারা বেঁচে থাকে, তাদের এত বড় বন্ধু বুঝি আর কিছু নেই !

সুরেশ কহিল, এ যুক্তি আমি বহুবার শুনেছি ভাই, কিন্তু যে বস্তুটা মানুষের মনুষ্যত্বকে নষ্ট করে দেয়—

নির্ম্মল বাধা দিয়া কহিল, থাক্। জান্‌লে সুরেশ, ছেলেবেলায়

'মরালিটি'র প্রবন্ধ লিখে আমিই প্রথম প্রাইজটা পেয়েছিলুম। তোমার বিশ্বাস হয়? আচ্ছা, আমি এখন উঠলুম। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলুম, দশ-বার দিন দেখা হয়নি, ভাবলুম, একবার দেখা করে যাই। ক্ষতি হয় ত একটু হ'লো, এর জন্যে ক্ষমা চেয়ে তোমার বন্ধুত্বের অপমান করতে চাই না!

তার কোন আবশ্যকও নেই ভাই; কিন্তু এ অবস্থায় তোমায় ত আমি যেতে দিতে পারি না।

অর্থাৎ, বাড়ীতে গেলে সুনামটা আর আমার বাঁচিয়ে রাখা যাবে না? কিন্তু, আর যাই করি, বাড়ী গিয়ে যে মাতলামি ক'র্‌ব না, এ আমি তোমায় 'গ্যারাণ্টি' দিতে পারি।

'গ্যারাণ্টি' না দিলেও তা' আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু এখানে থাকলে আজ তোমার কোন অসুবিধা হবে না, বাড়ীতে আজ কেউ নেই।

সুরার তীব্র নেশায় বহুক্ষণ ধরিয়া সে ক্লান্তি অনুভব করিতেছিল, তাই বন্ধুর এ অনুরোধ সে আর উপেক্ষা করিল না।

* * * *

সুনীতিবাবু পাকা লোক। পিতৃমাতৃহীনা এই ভাগ্নীটীকে তিনি আশৈশব পালন করিয়াছিলেন, তাই তাহার ভবিষ্যতের দিকে তিনি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন। উপযুক্ত লেখাপড়া শিখিয়া রেবা যখন যৌবন-উষায় জাগিয়া উঠিল, তখন হইতেই তিনি তাহার জন্য একটী সুপাত্র খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি মনে মনে নির্ম্মলকেও একটা স্থান দিয়াছিলেন, কিন্তু সেদিন যখন এই ডাক্তার

ছেলেটীর সন্ধান পাইলেন, তখন আর তিনি লোভ সাম্‌লাইতে পারিলেন না, একেবারে দিনস্থির করিয়া শুভ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ফেলিলেন।

রেবা স্বামীর ঘর করিতে আসিল; প্রকাণ্ড বাড়ী, বহু দাস-দাসী, অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য। নারীজীবনের যাহা কিছু কাম্য তাহা সে সকলই পাইল, এমন কি, প্রয়োজনের অধিকই পাইল। স্বামী আদর করিয়া বলে, রেবা, এতদিন তোমায় না পেয়ে আমি যে কি করে ছিলুম, তাই এখন কেবল ভাবি!—রেবা হাসিয়া চলিয়া যায়। স্বামী তাহাকে টানিয়া আনিয়া বক্ষে চাপিয়া ধরে; চুমু খাইয়া তাহায় গালদুটা রঙীন করিয়া দেয়—রেবা স্বামীর আলিঙ্গনের মধ্যে স্থির হইয়া থাকে। যাও, তুমি আমায় ভালবাস না, বলিয়া স্বামী আদর ভিক্ষা করে,—রেবা ছুটিয়া তাহাকে আদর করিতে যায়, কিন্তু পারে না—ফিরিয়া আসে।

এম্‌নি করিয়া তাহার দিন কাটিতেছিল।

বৈশাখ মাস। সকাল হইতেই যে বিপ্লবের স্থচনা হইয়াছিল, সন্ধ্যার সময় তাহা ঝড়বৃষ্টি লইয়া উপস্থিত হইল। তারপর প্রকৃতির যে তাণ্ডবনৃত্য সারা ধরিত্রীকে কাঁপাইয়া তুলিল, তাহা চক্ষু কর্ণ সজাগ করিয়া উপলব্ধি করে, এমন কঠিন প্রাণ সংসারে অল্পই আছে!

স্বামীর ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া রেবা উৎসুক হইয়া উঠিল, তারপর কোন্ এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িল।

রাত্রি যত বাড়িতে লাগিল প্রকৃতির এই উন্মাদ নৃত্যও যেন ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিলে রেবা স্বামীর

বুকের উপর একখানি হাত রাখিয়া কহিল, কখন্ এলে ? জলের জন্য বুঝি দেরী হ'লো ?

না। আজ একটা বড় 'এক্সিডেন্ট-কেস্' এসে পড়ল, তাই হাঁসপাতাল থেকে তাড়াতাড়ি ফির্তে পারলুম না। ছেলেটী এম-এ পড়ে, সন্ধ্যার সময় বাড়ী থেকে বেরিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কোথায় একটু মদ খেয়েছিল, নেশার ঝোঁকে একেবারে একটা মোটরের মুখে পড়ে গেছ্ল। জল-বৃষ্টি দেখে ড্রাইভারও খুব জোরে গাড়ী চালাচ্ছিল, কিছুতেই আর থামাতে পার্লে না—বুকের ওপর দিয়ে গাড়ীখানা একেবারে বেরিয়ে গেছে! বাপকে খবর দিতে, বাপ এসে হাজির হ'লো। উঃ, তাঁর কি কান্না! কিছুতেই তাঁকে থামান যায় না!

কান্নার কথা শুনিয়া রেবার চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল। কহিল, ভদ্রলোকের ছেলে ত, তবে তিনি মদ খেলেন কেন?

শুন্‌লুম, খুব ভালছেলে, আর ক'দিন পরেই তার পরীক্ষা। কি যে একটা তার জীবনে হয়েছে, পড়াশুনাও আর করে না—যখন তখন মদ খায়। বেচারী এখন্ বাঁচ্‌লে হয়?

তাঁর বাড়ী কোথায় ?

এই শিবতলায়—বেশী দূরে নয়।

রেবা উৎসুক হইয়া কহিল, শিবতলায় ? কাদের বাড়ী ?

বাপের নাম বুঝি প্রিয়বাবু!

রেবা চীৎকার করিয়া কহিল, তাঁর নাম ? বল বল, নির্ম্মল ত নয়?

হাঁ। তুমি কি করে জান্‌লে ?

রেবা এ প্রশ্নের উত্তর দিল না। সজোরে স্বামীর বুকের উপর পড়িয়া অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাসে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

স্বামী কহিল, রেবা, তুমি তাঁকে দেখ্‌তে যাবে?

একটা অস্ফুট স্বর তাহার হৃদয়ের কোন্ তলদেশ হইতে উঠিয়া আসিয়া কহিল, হ্যাঁ।

# মূলধন

আমার ভাই-বোন্ সব মরে যাবার পর, আমিই যখন আমার বাপ-মার শেষ সম্বল হ'য়ে উপস্থিত হ'লুম, তখন পাছে বেশী যত্নে আমিও আবার তাঁদের ফাঁকি দিয়ে চলে যাই, এই ভয়ে তাঁরা আমায় তত বেশী আদর কর্‌তেন না। বাবা আমার তাচ্ছিল্য-ভরে নাম রেখেছিলেন, ঘেন্না। আর এই নামটাই শেষকালে আমার ডাকনাম হয়েছিল। আমার মনে হয়, বাবা যেন আমার সমস্ত ভবিষ্যৎটা জানতে পেরেই এই নামটা দিয়েছিলেন। ভাগ্যিস্, বাপ-মা আজ বেঁচে নেই, নইলে তাঁদের দেওয়া নামটা যে আমি এম্‌নি করে সার্থক করে তুল্‌ব, তা' তাঁরা চোখে দেখে কিছুতেই সহ্য কর্‌তে পার্‌তেন না। তাই নিজের এই কাহিনী লিখ্‌তে বসে আজ কেবলি আমার মনে হ'চ্ছে, ভগবান, তোমার দয়ার কি

আর সীমা নেই! নইলে এত বড় পাপীর যে কোনদিন মুক্তি হ'তে পারে, একথা কখনও কি মনের কোণে স্থান দিয়েছিলুম! প্রভু, যদি এত কর্‌লে, তবে আর আমায় যেন কাঙাল ক'রো না;—তাঁর পায়ের তলায় মাথা রেখে এ অভাগিনীর যেন মরণ হয়! এই আমার শেষ ভিক্ষা প্রভু, আর আমি কিছুই চাই না!

জানি, আজ আনন্দে আমার সমস্ত বুকখানা ফেটে যাবার মত হয়েছে; কিন্তু তবুও ব্যথার যে কাল দাগটী আমার বুকের মাঝে চিরে বসে গিয়েছে তাকে ত কিছুতেই মুছে ফেল্‌তে পার্‌চি না! থাক্ থাক্, এ যেন আর আমার না মোছে, নইলে হতভাগীর গর্ব্বের কি আর সীমা থাক্‌বে?

ওগো, সবার মত আমিও ত আমার স্বামীকে শুভলগ্নেই পেয়েছিলুম, তবে কেন আমার তাতে মন উঠ্‌ল না! সেজন্য যে দামটা আমায় দিতে হ'লো, তা' ভাব্‌লেও শরীর আমার শিউরে ওঠে! যখন লজ্জা সরমের আর কোথাও কিছু বাকি রইল না তখনই শুধু বুঝলুম, স্বামী যে দেবতা—তাঁকে যে চাই! তাই আজ ভাবি, আগে থেকে যদি এটা বুঝ্‌তুম তাহলে এত বড় শাস্তি আর আমায় ভোগ করতে হ'তো না। কিন্তু তা' কি হয়, তবে আর মেয়েছেলে হয়েছিলুম কেন?

স্বামী ছিলেন আমরা ঘোর অর্থলোভী। টাকার জন্যে যে পরিশ্রমটা তিনি কর্‌তেন, কারখানার ইঞ্জিনটাও বোধ করি অত পরিশ্রম কর্‌তে পারে না। দিন নেই, রাত নেই, কেবল টাকার চিন্তা! আফিস থেকে বাড়ী এসে সেই যে বেরিয়ে যেতেন, রাত্রি বারোটার আগে আর কখন বাড়ী আস্‌তেন না। বাড়ী এসেই

কি ছাই নিস্তার ছিল! অম্‌নি দোকানের খাতা খুলে কার কাছে কত ধার পড়ে আছে, তারই হিসেব করে মেজাজ যখন তাঁর গরম হ'য়ে উঠ্‌ত তখনি কেবল তিনি বিছানায় শুতে আস্‌তেন। ভোর না হ'তে হ'তেই খাতা বগলে করে দোকান চলে যেতেন, আবার দশটা বাজ্‌তে না বাজ্‌তেই দু'মুঠো মুখে গুঁজে আফিস চলে যেতেন।

একদিন আর থাকৃতে না পেরে বল্‌লুম, মানুষ কি এ সংসারে কেবল টাকা রোজগার কর্‌তেই এসেছে? তার কি আর কোন কাজ নেই?

স্বামী বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লেন, সে পরামর্শ তোমার সঙ্গে কর্‌তে হবে না কি?

আমি রেগে বল্‌লুম, না, আমার সঙ্গে খালি ভাত রাঁধার সম্পর্ক! বিনি পয়সার রাঁধুনী পেয়ে খুব হুকুমটা চালিয়ে নিলে যাহোক্!

তিনি বল্‌লেন, না পোষায় বাপের বাড়ী চলে যাও। এখানে অত নবাবী চল্‌বে না।

এত দুঃখেও একটু হাসি এল। বল্‌লুম, হাঁ, দেখ্‌চ না, কত নবাবী কর্‌চি! ভাগ্যিস্, বাবা জামা কাপড় পাঠিয়ে দেন তাই পরে বাঁচি, নইলে তোমার ভরসায় থাকৃতে হ'লে, আমাকে বোধ হয় গামছা পরেই কাটাতে হ'তো।

স্বামী রেগে উঠে বল্‌লেন, বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

আমি তেম্‌নি হেসে বল্‌লুম; বেরিয়ে গেলে পিণ্ডি তোমার রাঁধ্‌বে কে?

কথাগুলো বোধ হয় তাঁকে অত্যন্তই আঘাত করেছিল, তাই একবার মাত্র আমার মুখের দিকে চেয়েই না খেয়ে তিনি আফিস চলে গেলেন। সেদিন কি জান্‌তুম, এ শাস্তি আমার তোলা থাক্‌বে,—একটী কণাও আমি রেহাই পাব না!

আফিস থেকে ফিরে এসে তিনি বল্‌লেন, ওগো, খাবার-টাবার কিছু দাও, সারাদিন যে না খেয়েই কাট্‌ল!

কথাটী না কয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলুম। সকালের রাঁধা ভাতের থালা এনে তাঁর সাম্‌নে ধরে দিলুম—দিব্যি প্রশান্ত চিত্তে তাই খেয়ে তিনি দোকানে চলে গেলেন। সারারাত কেবল এই কথাটা বার বার মনে হ'তে লাগ্‌ল, এই মানুষটা কি সৃষ্টিছাড়া!

পাড়ায় থিয়েটার হবে। আমাদের পাশের বাড়ীর সুধা এসে বল্‌লে, আজ বৌদি' তোমায় থিয়েটার যেতেই হবে; সেবার অসুখ করেছিল বলে বড় ফাঁকি দিয়েছিলে! কথা শুনে মুখটা আমার ভারি হ'য়ে গেল। সুধা তা' লক্ষ্য করে বল্‌লে, আচ্ছা বৌদি', যখনি কোথাও যাবার কথা হয়, তখনি কেন মুখটা তুমি অমন কর বল ত? দাদা বুঝি এসব পচ্ছন্দ করেন্ না? মনে মনে বল্‌লুম, হা রে পোড়া কপাল, আমার কথা ভাব্‌বার কি তাঁর এক মুহূর্ত্ত ফুরসৎ আছে? ততক্ষণ দোকানের চিন্তা কর্‌লে তাঁর দু'পয়সা রোজগার হবে। কিন্তু কেন যে আমি কোথাও যেতে চাই না, সে খবরটা কিছুতেই তাকে দিতে পার্‌লুম না।

সন্ধ্যার সময় সেজে-গুজে সুধা এসে বল্‌লে, কই গো বৌদি', চল, যাবে চল, একটু সকাল করে না গেলে যে জায়গা পাওয়া যাবে না।

## মূলধন

না ভাই, তোমরা যাও, আমি যেতে পারব না—আমার অনেক কাজ বাকি আছে।

আচ্ছা বৌদি',এ তোমার কি রকম কথা বল ত? অত করে বলে গেলুম; একটু সকাল করেই ত কাজ কর্ম্ম সেরে নিলেই পারতে?

না ভাই, আমি যাব না। তোমরা যাও

আমার জিদ্ দেখে সে চলে গেল। কিন্তু সেইখানে চুপ করে বসে আমি ভাবতে লাগলুম, এরাও ত আছে? এদের স্বামারাও ত রাজা নয়, কিন্তু তবুও এদের কোন কিছুরই ত অভাব নেই! আর এম্‌নি বরাত আমার, সখ্ কি তাই জান্‌লুম না! স্বামীসুখ যে কি জিনিস, তার সঙ্গে আমার পরিচয়ই হ'লো না! সেই যে বিয়ের পর এ বাড়াতে এসেছি, নারী জাবনের সব সুখ যেন শেষ হ'য়ে গেছে! অথচ, স্বামীও আমার গরীব নয়; লেখাপড়াও না কি তিনি কিছু কিছু শিখেচেন! এম্‌নি ভাগ্য, আমার বরাতেই সব যেন উল্টো হ'য়ে গেল! আগে আগে ভাবতুম, আমার নিজের দিক্ থেকেই বোধ হয় কোন অভাব হয়েছে! তারপর, মেয়ে-ছেলের তূণে যত প্রকার অস্ত্র আছে, তার কোনটাই ত আমি প্রয়োগ করতে কসুর করিনি—কিছুই ত হ'লো না!—সবই যে আমার ব্যর্থ হ'য়ে গেল! আর্শির দিকে চেয়ে নিজের এই চেহারার দিকে যখনই তাকিয়ে দেখেছি, গর্ব্বে আমার সমস্ত শরীর ফুলে উঠেছে। তোমরা মনে করবে, এ আমার মিথ্যা কথা। কিন্তু না গো না, এ আমার মিথ্যা অহঙ্কার নয়! রূপ আমার ছিল—সত্যই আমি সুন্দরী ছিলুম! কিন্তু এ নিয়ে আজ আর আমি অহঙ্কার করতে চাই না। ছিঃ! ভাবলেও আজ আমার

দেহের প্রতি অণু পরমাণু যেন চীৎকার করে ওঠে, ওরে, গেলুম গেলুম, আর আমরা অনুশোচনার জ্বালায় পুড়ে মরতে পারি না, তার চেয়ে একেবারে পুড়িয়ে ছাই করে দাও—আমরা মুক্তি পাই।

উঃ, সেদিনটা কি মনেই পড়ে! স্বামী আমার কি একটা কাজে ভোর হ'তেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন, যখন ফিরে এলেন, তখন তাঁর আফিস যাবার বেলা হ'য়ে গেছে। স্নান করে ঘরে এসে বল্‌লেন, ঘেন্না, বড় বেলা হ'য়ে গেছে, একটু তাতাড়ি ভাত বেড়ে দাও।

আগের রাত থেকে চাল ফুরিয়ে গিয়েছিল, স্বামীও অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরেছিলেন—সেকথা তাঁকে বলা হয়নি।—বাক্সের চাবিটাও সেদিন তিনি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন, নইলে বরাত আমার পুড়বে কেন? কম ঘেন্নায় আর গলাটা টিপে দিতে ইচ্ছে করে!

তিনি আবার বল্‌লেন, কই, ভাত দিলে?

আমি চীৎকার করে বল্‌লুম, চালটাও কি আমি বাবার ঘর থেকে আন্‌ব না কি? সেই যে ভোর হ'তে বেরিয়ে গেলে, আর এই বাড়ী এলে!

স্বামী স্তম্ভিত হ'য়ে বল্‌লেন, তাহলে কি রান্না হয়নি?

আমি বিদ্রূপ করে বল্‌লুম, চাল না হ'লে ভাত হয় না, এই সোজা কথাটা কি তুমি বুঝ না?

চুপ্ চুপ্, রমেশ বোধ হয় ডাক্‌ছে! এই বলেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ফিরে এসে বল্‌লেন, ওগো, আমি এখন আফিস যাই, জিনিস-পত্র সব ঝি-এর হাতে কিনে দিয়ে যাচ্চি—রমেশকে তুমি খাইও। ওদের মেসে আজ বামুন আসেনি, আবার কোথায় হোটেলে খেতে যাবে?

গরজ থাকে তুমি নিজে খাইও, আমি ওসব পার্‌ব না।

ছিঃ! দেখ, ও আমার বিশেষ বন্ধু, একসঙ্গে দোকান করেছি, এ অবস্থায় ওকে খেতে না বলাটা কি ভাল ছিল?

ভাল-মন্দ বোঝ্‌বার যদি এতই শক্তি হয়েছে, তবে আগে রাঁধুনীর বন্দোবস্ত করনি কেন? কারুর ত কেনা ঝি নই আমি, যে, হুকুম কর্‌লেই তা' আমায় পালন কর্‌তে হবে?

স্বামী একটু বিব্রত হ'য়ে পড়লেন। দেখ, ওকে আমি খেতে বলেছি, এখন আর কি করে বারণ করি বল?

একটু দয়া হ'লো, তাই চুপ করে রইলুম। তিনি জিনিষ-পত্র কিনে দিয়ে আফিস চলে গেলেন। বার বার বলে গেলেন, রমেশকে দেখে যেন লজ্জা ক'রো না; ওকে একটু যত্ন করে খাইও, ও আমায় বড় ভালবাসে।

স্বামীর কথা অগ্রাহ্য কর্‌তে নেই, তাই বোধ হয় যত্নের সেদিন আর সীমা ছিল না! আজ ভাবি, এত বড় মিথ্যাটা কি করে আমায় ভুলিয়ে রেখেছিল। স্বামীছাড়া যে মেয়েমানুষের আর কিছু নেই, এটা কি ছাই তখন একবারও ভেবেছিলুম! নইলে এ কলঙ্কের সৃষ্টি হবে কেন?

ঝি এসে বল্‌লে, সেই বাবুটী এসেছে মা।

আচ্ছা, তুই তাঁকে ডেকে আন্‌:—আমি রমেশবাবুর জায়গা কর্‌তে লাগ্‌লুম।

ঘরে এসে তিনি একটু লজ্জাবোধ করতে লাগলেন। এর পূর্ব্বে তিনি বোধ হয় আর কখনও এমন বিপদে পড়েননি।—নির্জ্জন ঘরে শুধু তিনি আর আমি! আমি বেশ লক্ষ্য করেছিলুম, আমায় দেখেই চোখ দু'টো তাঁর অত্যন্ত চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল।

খেতে খেতে তিনি বললেন, অসময়ে এসে আপনাকে বড়ই কষ্ট দিলুম।

এ আর কি কষ্ট বলুন? সংসার করতে হ'লে এসব একটু-আধটু হ'য়েই পড়ে, এর জন্যে আর নূতন করে কোন কষ্ট হয় না।

আচ্ছা, কাজ-কর্ম্ম কি সব আপনি একলাই করেন?

তা' ছাড়া আর কে করবে বলুন? দুটী প্রাণী আমরা—কাজও ত তত বেশী নয়!

তিনি যেন আর কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। আমি বললুম, আপনি বুঝি মেসে থাকেন?

হাঁ।

আপনার কে আছে?

কেউ নেই বললেই হয়, দেশে এক বিধবা বোন্ আছেন, তিনিই সেখানকার সব দেখেন-শোনেন।

এঁর সঙ্গে আপনার কত দিনের আলাপ?

তা' অনেক দিন হবে। আগে আমরা একসঙ্গেই মেসে থাকতুম। এই হালেই ত নীলুদা এখানে বাসা করেছেন?

হাঁ। আপনার বুঝি বিয়ে হয়নি?

তিনি একটু লজ্জা পেয়ে বললেন, না।

ওকি করচেন আপনি? অত লজ্জা করে খেলে আপনার দাদা কিন্তু এসে রাগ করবেন।

সে ভাবনা আপনার নেই, বেশী খেলেই দাদা আমার রাগ করবেন।

আপনি দেখচি আপনার দাদাটীকে বেশ ভাল করেই চিনেছেন?

ওঃ, সেকথা আর বলবেন না, ওঁর সঙ্গে ঐ নিয়ে আমার অনেক তর্ক হ'য়ে গেছে। টাকার নেশা আর রাগ, এই দু'টী জিনিস্ হ'লো ওঁর নিজস্ব, তা' ছাড়া মানুষটা মন্দ নয়! আচ্ছা, আমার আসার আগে দাদার সঙ্গে আপনার বোধ হয় একটু—

কি বললে আপনি সুখী হন্? ঝগড়া, না?

না। তা' আমি বলচি না! আপনি আমায় মাফ করবেন। প্রশ্নটা আমার অত্যন্ত অসঙ্গত হয়েছে; এর জন্যে আমি বাস্তবিক দুঃখিত।

না না, আপনি উঠবেন না। এ অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু না খেয়ে আপনি উঠলে ক্ষমা ত দূরের কথা, এমন কি আপনার শাস্তি পর্য্যন্ত হ'তে পারে।

রমেশবাবু কুণ্ঠিত হ'য়ে বললেন, আমার খাওয়া হ'য়ে গেছে সত্যি, আর আমি খেতে পারব না।

যদি বলি, এই না খাওয়াটা আজকে আমার সমস্ত আনন্দকে নষ্ট করে দেবে, আপনি বিশ্বাস করেন?

সম্পর্কে আপনি আমার বৌদি', ঠাট্টাও আপনি আমায় করতে পারেন। কিন্তু আর আমার খাবার একটুও শক্তি নেই, তা'

আপনি বিশ্বাস করুন। নইলে মেসে খাওয়ার জীবনে এই রাজভোগ কখনই আমি ত্যাগ করে উঠতুম না। আজকের দিনটা চিরদিন আমার মনে থাক্‌বে—এমন যত্ন করে কেউ কখন আমায় খাওয়ায়নি।

এই তুচ্ছ বস্তুটা মনে করে রাখ্‌বার জন্যে আমি ত আপনাকে অনুরোধ করিনি।

অনুরোধ না করুন, কিন্তু যেটা সুন্দর, মানুষ মাত্রেই যে তা' ভুল্‌তে পারে না।

সত্যি না কি! কিন্তু তাতে বিপদও বড় কম নয়! ছেলেবেলায় পড়েন্‌নি, পরের দ্রব্যে লোভ কর্‌তে নেই!

রমেশ এ কথা লক্ষ্য কর্‌লে না, নিজের মনেই বল্‌লে, নীলুদা' একটা দিকে খুব জিতেছে—আপনার মত স্ত্রী পাওয়া অনেক পুণ্যের ফল!

তোমার দাদা কিন্তু তা' স্বীকার করে না ভাই।

তার মুখ লাল হ'য়ে উঠ্‌ল। সে বল্‌লে, এ মিথ্যা কথা। আমি জোর করে বল্‌তে পারি—

থাক্ ভাই থাক্। আজকের অহঙ্কার কাল হয় ত টিক্‌বে না। কিন্তু ভাই, এ গর্ব্ব আমার কিসের?

কিসের যে বৌদি' তা' আমি জানি না, কিন্তু আপনাকে ভুলে থাক্‌বার আর আমার শক্তি নেই।

ঠাকুরপো, এত বড় মিথ্যা কথাটা কি করে মুখ দিয়ে বার কর্‌লে বল ত?

মিথ্যে কথা? কিছুতেই নয়। এই আপনার পা ছুঁয়ে বল্‌চি—

উঃ, আপনি কি বলুন ত, এঁটো মুখটা আমার মুখে লাগিয়ে দিলেন ?

অপরাধীর মত রমেশ চুপটী করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি বল্‌লুম, চলুন, হাতটা ধুয়ে ফেলুন। যা হয়েছে ও ত আর আপনি ফিরিয়ে নিতে পার্‌বেন না। আপনি ত আর দেখে করেননি।

সত্যি বল্‌চি আমি—

ভয় নেই, এমন কিছু অপরাধ করেননি। অজান্তে মানুষ কত কি যে করে ফেলে!

কিন্তু—

এতে কিন্তুর কিছু নেই ঠাকুরপো।

আপনি কি আমায় ক্ষমা কর্‌তে পার্‌বেন ?

ক্ষমা ?—ঠাকুরপো, তুমি বড় চালাক! আমার নিজের মুখ থেকে কথাটা না শুনে কিছুতেই তুমি নিশ্চিন্ত হবে না। কিন্তু এর পরও আমাকে কবুল করিয়ে নেওয়াটাই কি তোমার সব চেয়ে বড় পাওয়া হবে? এই যে বল্‌ছিলে, আজকের দিনটা চিরদিন তোমার মনে থাকবে, তবে, সেটার কি কোন অর্থ নেই ?

সে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল, তারপর কোন রকমে হাত-মুখ ধুয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

দিনকতক পরে একটা বড় ইলিশ-মাছ নিয়ে সে সন্ধ্যার সময় এসে বল্‌লে, কই গো বৌদি, আমার হাতে একটু জল দাও ত। শিবপুর গেছ্‌লুম, দেখ্‌লুম, জেলেরা

মাছ ধর্‌চে, সস্তায় মাছটা তাদের কাছে থেকে কিনে আন্‌লুম।

বেশ করেছ। ব'স। কিন্তু আমি যে ইলিশ মাছ ভালবাসি এ খবর তুমি পেলে কোথা থেকে? তোমার দাদা বুঝি তোমায় বলেছেন?

না। আমার সঙ্গে ত তাঁর কোন কথা হয়নি। সাম্‌নে পেলুম, তাই কিনে আন্‌লুম।

ওঃ, এ বুঝি সেই খাওয়ার প্রতিদান? তা' ভাল, কিন্তু ঠাকুরপো, যে মাছ জালে জড়িয়ে গেছে তাকে তুল্‌তে ত বেশী কষ্ট নেই ভাই, তার জন্যে আর এ ব্যবস্থা কেন?

রমেশ আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌লে, তুমি কি যে বল্‌চ, বৌদি' তা' আমি বুঝ্‌তে পার্‌চি না।

বুঝেছ বৈকি, শুধু স্বীকার কর্‌চ না। আমারই কি ছাই ইচ্ছে হয়নি, কিন্তু কি কর্‌ব? সেই যে সেদিন চলে গেলে, আর দেখাটা পর্য্যন্ত দিলে না। এমনি করেই কি ভুলে থাক্‌তে হয় ভাই?

বৌদি' লেখাপড়া কিছু শিখেচি বটে, কিন্তু তোমার সব কথার মানে বুঝা সত্যিই আমার সাধ্য নয়। মাছটা এনে যদি সত্যিই কোন দোষ করে থাকি তাহলে ওটা ফেলে দাও, সব গোল চুকে যাবে

তা' কি হয় ভাই? তোমার এই বৌদি'টা খাবে বলে, কত সাধ করে তুমি বয়ে নিয়ে এলে, আর আমি কি এতই নিষ্ঠুর যে

সেটা ফেলে দেব! একটা ঠাট্টাও বুঝনা ভাই! আচ্ছব,সা, মাছটা কুটে ভেজে নিতে দশটা মিনিটের বেশী আমার লাগ্‌বে না, এর মধ্যে যেন পালিয়ে যেওনা। তোমার দাদা আজ আর ফির্‌বেন না, আফিস থেকেই দেশে চলে যাবেন।

খাওয়া-দাওয়া সাঙ্গ করে রমেশ বল্‌লে, একটা ছাতিটাতি দাও বৌদি', এ জল আর ছাড়্‌বে না।

একটু ব'স না ভাই, এত তাড়াতাড়ি কেন? মেসে ফিরে ত দেরী হওয়ার কৈফিয়ৎ দিতে হবে না?

না, সে বালাই নেই। কিন্তু এত খাওয়ার পর আর ত বসে থাক্‌বার শক্তি নেই বৌদি'।

নেই বা রইল, আমিই কি তা' তোমায় বল্‌চি? বসে না থাক, আর যাই হোক, তোমার দাদার বিছানাটা ত আর অপরিষ্কার নয়!

ওঃ বাবা, একবার বিছানা পেলে, সারা রাত ধরে কেউ ঠেল্লেও আমায় তুল্‌তে পার্‌বে না।

তার প্রয়োজন হ'লো না। বাইরে আকাশের অবস্থা ক্রমে ক্রমে এম্‌নি ভীষণ হ'য়ে উঠল যে, সেরাত্রি রমেশ আর মেসে ফির্‌তে পারলে না। আমি আলো নিভিয়ে মেজের ওপর শুয়ে পড়লুম। কিন্তু কিছুতেই ঘুমুতে পার্‌লুম না। কোন্ এক সময়ে রমেশের বিছানার উপর উঠে গিয়ে বল্‌লুম, ঠাকুরপো কি, ঘুমুলে না কি? তার চোখেও কি পোড়া ঘুম ছিল? আমার মত অন্ধকারের দিকে চেয়ে চেয়ে মনটা যখন তার বিষিয়ে উঠেছিল, আমি তখন তার বিছানায় গিয়ে বস্‌লুম। তার বুকের উপর একখানা হাত

রেখে কতক্ষণ যে আমার কেটে গেল তা' আমার হুঁস্ ছিল না।

রমেশ ধীরে ধীরে আমার হাতখানি তার নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলে উঠ্‌ল, আজ কি লজ্জা নিয়েই যে এখানে এসেছিলুম, তা' আমিই জানি। এতদিন দিনরাত্রি কি ভেবেছি জান?

কি?

ভেবেছি, এ হ'তে পারে না; এ ভুল! কিন্তু তোমাকে একবার মাত্র দেখ্‌বার লোভ আমাকে এম্‌নি করে মাতিয়ে তুল্‌লে যে শেষে এই ছল করে এখানে আমায় আস্‌তে হ'লো। হটাৎ আমার পায়ের উপর সে মাথা রেখে বল্‌লে, তুমি বলে দাও, আমি কি কর্‌ব? আমি আর যে সহ্য কর্‌তে পার্‌ছি না ঘেন্না! বুকের ভিতরটা যে আমার জ্বলে-পুড়ে ছার্‌খার হ'য়ে যাচ্ছে!

চুপ করে রইলুম, কিন্তু তার এই উদ্দাম উচ্ছ্বাসে আমি একেবারে ভেসে গেলুম।

নিজের এই কাহিনী লিখ্‌তে বসে চোখ দু'টো আমার জলে ঝাপ্‌সা হ'য়ে উঠ্‌ছে, কিন্তু তবুও আমায় সবটুকু তোমাদের বল্‌তে হবে, নইলে এ বোঝা আর যে আমি বইতে পারি না! আমি যে গেলুম! আর যে তোমাদের ঘৃণা আমি সহ্য কর্‌তে পারি না! ওগো, বুকের ভিতরটা যে আমার হাজার করাতে অহরহঃ চিরে দিচ্ছে! সে খবর কি তোমরা পাও? তোমাদের পায়ে পড়ি, আর আমি তোমাদের চাপা হাসি সহ্য কর্‌তে পারি না!

তারপর আমার মাথা খেতে আফিসের কাজে স্বামী চ'লে গেলেন বোম্বাই। বলে গেলেন, ফির্‌তে প্রায় এক মাস দেরী হবে।

যখন যা দরকার হবে রমেশকে ব'লো তাকে আমি সব বলে দিয়েছি। এমন বন্ধু আর আমার হবে না।

কথা শুনে ঠোঁট দুটো আমার চাপা হাসিতে নড়ে উঠ্‌ল। তিনি তা' লক্ষ্য কর্‌লেন না; শুভযাত্রা করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন।

তাঁর ফের্‌বার আর দিন দুই দেরী আছে; রাত্রে খেয়ে নিয়ে শোবার বন্দোবস্ত কর্‌ছি, রমেশ এসে ঘরে ঢুক্‌ল। তার মাথার চুল এলোমেলো; গায়ের জামাটা যেম্‌নি ময়লা তেম্‌নি ছেঁড়া; চোখের দৃষ্টি ভীষণ চঞ্চল।

আমি বল্‌লুম, কি হয়েছে?

একটা কঠিন দৃষ্টিতে সে আমার স্বামীর ফটোর দিকে একবার চেয়েই আমার হাত দুটো ধরে ফেলে বল্‌লে, সেদিন তুমি যে বল্‌ছিলে—সে আর কিছু বল্‌তে পার্‌লে না।

আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, কি বল্‌ছিলুম?

এখানে থাকলে তুমি সুখী হবে না।

বুকের ভিতরটা আমার কেঁপে উঠ্‌ল। আমি ভয়ে ভয়ে বল্‌লুম, না না, তা' আমি পারব না।

সে অসম্ভব জোরে আমার হাত দুটো ছুঁড়ে ফেলে বল্‌লে, তবে বুঝি এতদিন তুমি আমায় নিয়ে খালি খেলে বেড়িয়েচ?

অবরুদ্ধ নালার প্রথম বেগের মত চোখের জলে আমার বুক ভেসে গেল। সে আস্তে আস্তে বল্‌লে, তবে ভয় কিসের? ট্রেনের আর সময় নেই। আমি সব ঠিক করে এসেছি।

কোথায় যাব?

বাইরে মোটরের শব্দে রমেশ আমার হাত দু'টো টেনে নিয়ে বল্‌লে, চলে এস।

*　　　*　　　*

হায় রে, মানুষ ঠিক যে কি চায় তা' যদি সে জান্‌ত, তাহলে সংসারে এত কান্নার আর সৃষ্টি হ'তো না। নিজেকে বুঝ্‌তে যে তার কত ভুল হয়, এ কথা আমার চেয়ে কে বেশী জানে? মনে করেছিলুম, স্বামীকে ছেড়ে রমেশকে নিয়ে কোথাও পালিয়ে গেলে জীবনটা ভোগ করে বুঝি শেষ কর্‌তে পার্‌ব না! এ সুযোগ রমেশ ত্যাগ কর্‌তে পার্‌লে না। সেদিন যখন সে আমায় স্বামীছাড়া করে বাড়ী থেকে টেনে নিয়ে গেল, একটী মুহূর্ত্তও কাট্‌ল না, সবই এম্‌নি বিশ্রী হ'য়ে গেল যে, চোখ চেয়ে আর কোন দিকে আমি তাকাতেই পার্‌লুম না। অথচ, এরই লোভে একদিন আমার কি নেশাই না হয়েছিল!

কাশীর একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন গলির মধ্যে বহুদিনের একটা পুরাণো পাথরের বাড়ী রমেশ আগে থেকেই ঠিক করেছিল। গাড়ী থেকে পা বাড়িয়ে এই বাড়ীটার দরজায় পা দিতেই আমার সমস্ত শরীরটা ভূমিকম্পে স্পন্দিত গৃহের মত দুল্‌তে লাগ্‌ল—কোন রকমে পাশের দেওয়ালটাতে ঠেশ দিয়ে আমি রক্ষা পেলুম। ওঃ, সেদিন যদি সেখানেই আমার সব শেষ হ'য়ে যেত!

আমার অবস্থা দেখে রমেশ বাজার থেকেই খাবার-টাবার কিনে নিয়ে এল, কিন্তু যে দু'দিন আমি ছিলুম, একটী টুক্‌রও আমি মুখে দিতে পারিনি। নির্জ্জলা উপবাসে শরীর আমার এম্‌নি ভেঙে পড়্‌ল যে উঠে দাঁড়াবার আর শক্তি রইল না। রমেশ তা' লক্ষ্য

করে বল্‌লে, বৌদি', জোর করে বনের বাঘ ঘরে পোষা যায়—কিন্তু এ অসাধ্য সাধন কর্‌বার ব্যর্থ চেষ্টায় আর আমি তোমায় ছোট করতে চাই না। সেদিন তুমিও যে নিজেকে বুঝ্‌তে পারনি, এ খবর যদি আমি পেতুম, তাহলে এ ভুল কিছুতেই তোমায় আমি কর্‌তে দিতুম না। ভেবেছিলুম, দূরপ্রবাসে অপরিচিতের মধ্যে আর আমাদের কোন সঙ্কোচ কোন বাধা থাক্‌বে না, কিন্তু সে আমার মস্ত ভুল হয়েছিল—আর না! কোথাও গিয়ে আমি আমার বাকি জীবনটাকে কাটিয়ে দেব, কিন্তু তুমি ফিরে যাও—সুখী হও; এই আমার প্রার্থনা!

একটা আশার আলোয় আমার বুকের রক্ত উদ্দাম হ'য়ে উঠ্‌ল। হয় ত এখনও তিনি ফেরেন্‌নি—এখনও কোন উপায় আছে। ভাব্‌তে ভাব্‌তে কখন্‌ আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম! চেয়ে দেখি, স্বামী আমার মাথার উপর হাত বুলুচ্চেন। স্বপ্ন. না সত্য? আশা, না নৈরাশ্য—কিছুই যেন স্থির কর্‌তে পার্‌লুম না! না—না, এ ত স্বপ্ন নয়!—আমি মূর্চ্ছিতা হ'য়ে পড়্‌লুম।

কতকক্ষণ পরে যে আমার মূর্চ্ছা ভাঙ্‌ল তা' আমার মনে নেই। স্বামী বললেন, অনেক দিন এ রোগটা হয়নি, রাত্রে না ঘুমিয়েই বোধ হয় হ'লো।

রমেশ জলের ঘটিটা নামিয়ে রেখে বল্‌লে, এত বল্‌লুম, গাড়ীতে এখন ভয়ানক ভীড় হবে—এ মহাযোগ—অন্য সময় যাবেন; উনি কিছুতেই শুন্‌লেন না। সেই স্নানও কর্‌তে পেলেন না, অথচ কষ্টের সীমা রইল না!

স্বামী বল্‌লেন, আমিও ত সেইজন্যে এখানে নাম্‌লুম্।

একেবারে কাছ দিয়ে চ'লে যাচ্ছি—আবার কখন হবে কি না হবে, ভাবলুম, সকালে নেমে স্নানটা করে নিয়ে বিকেলের গাড়ীতে কল্‌কাতা চলে যাব। এখন এ অবস্থায় আজ আর বোধ হয় যাওয়া হবে না?

না। আজকের রাতটা থাক্—কাল ভোরেই একেবারে সব চলে যাবেন। আমাকে আবার একবার এলাহাবাদ ঘুরে যেতে হবে।

স্বামী উৎসুক হ'য়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, এলাহাবাদে কেন?

রমেশ বল্‌লে, একটু কাজ আছে।

নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে আমি সব শুন্‌ছিলুম, কিন্তু প্রতিবাদ কর্‌বার আমার শক্তি ছিল না।

সন্ধ্যার সময় একটা ব্যাগ্ হাতে করে রমেশ আমার কাণের কাছে আস্তে আস্তে বলে গেল, আমি চল্‌লুম। সত্যি বলার প্রয়োজন বোধ হয় আর তোমার হবে না।

ভোরের বেলা স্বামী একটা গাড়ী এনে বল্‌লেন, ঘেন্না, একটু তাড়াতাড়ি সেরে নাও—ষ্টেশনে পৌছিতে অনেকটা সময় নেবে।

মোটা চাদরখানা গায়ের উপর জড়িয়ে নিয়ে আমি স্বামীর পাশে এসে বস্‌লুম। মনে হ'লো শ্রীরামচন্দ্র যেমন করে তাঁর জানকীকে লঙ্কা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছিলেন, ইনিও বোধ হয় আজ তেম্‌নি করেই আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে চল্‌লেন। আমি বাঁচ্‌লুম! আমি বাঁচ্‌লুম!

# পলাতক



## এক

বাবা ছিলেন আমার মস্ত বড় একজন ধার্ম্মিক। সূর্য্যিঠাকুরের ঘুম ভাঙ্‌তে না ভাঙ্‌তে তাঁর ঘুম ভেঙে যেত, তারপর সেই যে তিনি গীতা নিয়ে বস্‌তেন বেলা ৮টার আগে আর কখন সেখান থেকে উঠ্‌তেন না। কিন্তু এতে আমার বড় মুস্কিল হ'তো। রাত্রি দুপুর পর্য্যন্ত থিয়েটারের ক্লাবে গান-বাজনা করে এসে কোথায় একটু ঘুমুব, বাবার গীতা পাঠের চোটে সেটী হ'বার যো ছিল না! এক একদিন মনে হ'তো বইটা লুকিয়ে রেখে দেব তাহলে আর তিনি সকালবেলায় উঠে চেঁচাতে পার্‌বেন না। কিন্তু বাজারে কি পোড়া, বইয়ের অভাব ছিল! তাই একদিন নিরূপায় হ'য়ে মাকে ডেকে বল্লুম, মা, তুমি যদি

বাবাকে বল তাহলে তিনি গীতাপাঠটা একটু আস্তে আস্তে করতে পারেন।

মায়ের প্রাণ! কাজেই সন্ধ্যার সময় বাবা বাড়ী আসতে মা গিয়ে বল্‌লে, দেখ, তোমার গীতা পড়ার জন্যে কেব্‌লা ঘুমুতে পারে না—কাল থেকে যদি একটু আস্তে আস্তে পড়।—জান ত, কত রাত্রে ও শুতে আসে!

বাবা চুপটী করে রইলেন, কোন উত্তর কর্‌লেন না। ঘরের মধ্যে এসে আমাকে দেখ্‌তে পেয়েই আমার গালে জোরে একটা থাব্‌ড়া বসিয়ে দিয়ে বল্‌লেন' সারারাত ইয়ারকি মেরে এসে বেলা বারোটা অবধি ঘুমুতে হবে বলে আমায় গীতা পড়তে বারণ করা হয়েছে! লক্ষ্মীছাড়া দূর হ'য়ে যা বাড়ী থেকে

কি বল্‌ব বাবা, নইলে ইচ্ছে হচ্ছিল এর প্রতিশোধ নিই! কোথায় আমার সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার কর্‌বেন—তা' নয়, আমাকে আবার মার্! এত গীতা পড় বাবা, আর চাণক্য শ্লোকটা একবার পড়তে পারনি! সত্যিকালের পণ্ডিত ত ঐ চাণক্য! নইলে কে আমাদের ব্যথা বুঝ্‌ত!

হঠাৎ মাথায় একটা বেশ মতলব খেলে গেল! আমি তাড়াতাড়ি আমার ছোটভাই বীণুকে গিয়ে বল্‌লুম, হাঁরে বীণু, তুই চাণক্যশ্লোক পড়েছিস্? সে সগর্ব্বে বল্‌লে, হাঁ, শুন্‌বে দাদা একটা শ্লোক? আমি বল্‌লুম, আচ্ছা, বল্ দেখি সেই শ্লোকটা—"লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি—" বীণু তার গলার আওয়াজটা বেশ একটু চড়িয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল—"লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ, প্রাপ্তে তু ষোড়শে-

বর্ষে পুত্র মিত্র বদাচরেৎ।" বাবা তখন পাশের ঘরে বসে জলখাবার খাচ্ছিলেন, মুখটা পঁ্যাচার মত গম্ভীর করে এসে বল্লেন, এ সব চালাকি বুঝি আমি বুঝ্তে পারিনি? আমায় শেখান হচ্চে, না? নিজের মাথা ত খেয়েছ, এখন ওটাকে পর্য্যন্ত কি নষ্ট করতে চাও? এই বলে তিনি হন্ হন্ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে মাকে ডেকে বল্লেন, দেখ, কেলোকে বলে দিও, সে যেন বীণুর কোন সম্পর্কে না থাকে, নইলে কুরুক্ষেত্র হবে বলে দিচ্চি।

নিজের অধিকার নষ্ট হয় দেখে আমি আর সহ্য করতে পারলুম না, আস্তে আস্তে বল্লুম, আমি ওর বড় ভাই, ওর ভাল-মন্দ আমাকেও দেখ্তে হবে। তারপর বীণুকে শাসিয়ে বল্লুম্—দেখ্, যখন যা বল্ব তাই করবি। যদি কোনদিন কথা না শুনিস্, তাহলে পিঠের চাম্ড়া তুলে দেব। সে ছেলেমানুষ, তার উপর আমটা কলাটা মাঝে মাঝে তাকে যোগাড় করে দিই, কাজেই সে ঘাড় নেড়ে বল্লে, তুমি দেখো দাদা, তুমি যা বল্বে তাই করব।

আমি বল্লুম, আচ্ছা তুই এখন পড়্—আমি একবার ওপাড়া থেকে ঘুরে আসি।

বাড়ী থেকে সবেমাত্র পা'টি বাড়িয়েছি বাবা অম্নি ডেকে উঠ্লেন, কেব্লা? রাগে আমার সমস্ত শরীর গর্ গর্ করতে লাগ্ল, বিরক্ত হ'য়ে বল্লুম, কেন?

কোথা যাওয়া হচ্চে, হতভাগা?

আমি বল্লুম, বোসেদের বাড়ী তাস খেল্তে।

কথা শুনে চোখ দু'টো যেন তাঁর অন্ধকারে বাঘের মত জ্বল্তে

লাগ্‌ল, কিন্তু রাগের ভারে তাঁর আর বাক্যস্ফুরণ হ'লো না। আমি সেই অন্ধকার পথে গাইতে গাইতে চল্‌লুম, "এবার কালী তোমায় খাবো—"

গানের সুর ভেদ করে আমার কাণে এসে পৌঁছিল, আচ্ছা দেখাচ্ছি, তুমি কত বড় ছেলে!

## দুই

জীবনের প্রভাতটা যে ভাবে সুরু হয়েছিল ঠিক সেই ভাবেই যদি এটা কেটে যেত তাহলে হয় ত এ কাহিনী লিখে জানাবার প্রয়োজন হ'তো না। কিন্তু তা' যখন হ'লো না, তখন এর সমস্ত বিড়ম্বনাই আমায় মুখটা বুজে সহ্য করতে হবে। জানি, সমাজের কাছে, সংসারের কাছে, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলের নিকটেই আজ আমি একটা লজ্জার বস্তু হ'য়ে দাঁড়িয়েচি। এত বড় একটা নামজাদা বংশে জন্মেও প্রবৃত্তিটা কেন যে আমার এম্‌নি বেয়াড়া হ'য়ে উঠ্‌ল, এর কোন খবরই আমি তোমাদের কাউকে দিতে পার্‌ব না। কিন্তু তোমরা যার নামটা শুনলেও ঘৃণায় মুখটা সরিয়ে নাও—সেই যে আমার সমস্ত ভিতর বাহিরকে তচ্ নচ্ করে দিয়েছে, এটা ত আমি অস্বীকার করতে পারি না! আজ সে আমাদের কারুরই সীমার মধ্যে নেই, কিন্তু তবুও তার সেই স্মৃতিটীর অবমাননা করে তোমাদের সঙ্গে পা ফেলে চল্‌বার শক্তি আমার কোথায়? ওগো, তোমাদেরই মত ত আমিও একজন! তবে সেই অতি ছোটঘরের মেয়েটার জন্যেই আমার সমস্ত জীবনটা

এম্‌নি ব্যর্থ হ'য়ে গেল কেন? এ প্রশ্ন আমি নিজেকে বহুবার করেছি, কিন্তু কেন যে, সে উত্তর আমি কোন দিনই খুঁজে পাইনি। তাই, যে প্রশ্ন বারে বারে উদয় হ'য়ে আমার সমস্ত যুক্তিকে ব্যর্থ করে দিয়েছে তার নিষ্ফল মীমাংসায় আর আমি কারুর সময় নষ্ট কর্‌তে চাই না। এবং জীবনের শেষ দিনটা পর্য্যন্ত যে এ বোঝা আমায় বয়ে বেড়াতে হবে তা' আমি জানি! কিন্তু আর না— আর মিথ্যা তর্কে বিতর্কে কোন লাভ নেই! যা আমার একান্ত আপনার, তার সমস্ত ভার যেন আমিই বয়ে বেড়াতে পারি। এর কোন লজ্জাই যেন কোনদিন আমার সঙ্কুচিত না করে!

উঃ, সে দিনটা কি মনেই পড়ে! রাত্রি ১০টার সময় বোসেদের বাগানের ভিতর দিয়ে ছুটে ছুটে আস্‌চি—রাত হ'য়ে গেছে—কোন রকম করে বাড়ী ফির্‌তে পার্‌লে হয়! কিন্তু কে জান্‌ত যে আমার সমস্ত গতিকে খর্ব্ব করে দেবার জন্যে সারা পথটা জুড়ে মনসাদেবীর ছোট চরটা শুয়েছিল। আমার সমস্ত শক্তিকে পরাজিত করে সে যখন আমায় একটা দুঃসহ যন্ত্রনায় মাটীর উপর লুটিয়ে দিলে, তখন সাম্‌নে পিছনে যে দিকেই তাকালুম কোথায় কারুর চিহ্নটা পর্য্যন্ত চোখে পড়ল না। শুধু আঁধারের বুক চিরে আমার আর্ত্তনাদ সমস্ত স্থানটার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগ্‌ল। তারপর, কেমন করে যে আমি আমাদের ভূতো প্রজার কুঁড়েতে এসে স্থান পেলুম, আর কেমন করেই যে সে রাতটা আমার কেটে গেল, তার কোন সংজ্ঞাই আমার ছিল না।

ভোরের দিকে চোখ চাইতেই মা আমার গুম্‌রে কেঁদে উঠে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, কেমন আছিস্ বাবা কেব্‌লা? আর ত যন্ত্রণা

হচ্চে না? কি করে যে রাতটা কেটেছে তা' নারায়নই জানেন! ভাগ্যিস্ এরা ছিল! এই বলে মা যাদের দিকে ফিরে চাইলেন, তারা হ'লো ভূতো আর তার মেয়ে পটল!

নিজের মনের মধ্যে রাত্রের ঘটনাটা একটু ভেবে নেবার চেষ্টা কর্‌লুম, কিন্তু কিছুই যেন মনে হ'লো না! শুধু এইটুকু বুঝ্‌লুম, কাল রাত্রে প্রাণটা যখন বেরিয়ে যাবার মত হয়েছিল, তখন ভূতো আর তার মেয়ে মিলে তার বেরুবার পথটা আট্‌কে ধরেছিল, তাই সেটা বেরুতে পারেনি।

দুঃখের পর হাসিটা বোধ হয় বড় মধুর লাগে, তাই একটু হেসে বল্‌লুম, দেখ্ ভূতো, মা যদি আমার রাজার মা হ'তো তাহলে নিশ্চয় তোকে একটা রাজত্বের অর্দ্ধেক দিয়ে দিত, কি বল মা? ভূতো ভাঙ্গা গলায় উত্তর কর্‌লে, আমি রাজত্ব চাইনে বাবু, আপনি ভাল হ'লেই আমার সব। তারপর যাবার সময় বাপ-মা আমার এই দু'টী বাপ-বেটীকে যত আশীর্ব্বাদ করে গেলেন তাদের একটীও যদি সফল হ'তো তাহলে ভূতোর বাকি জীবনের ইতিহাসটা নিশ্চয় একটু বদ্‌লে যেত। কিন্তু তা' কি হয়! মানুষের কথার মূল্য কি!

মা-বাপের যত্নে ও সেবায় শরীরটা যখন বেশ একটু সেরে উঠ্‌ল, তখন একদিন সন্ধ্যার সময় নদীর ধারে বেড়াতে গিয়ে হঠাৎ কেন যে ভূতোর বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়্‌লুম, সেটা এম্‌নি অস্বাভাবিক যে পটল ত প্রথমটা আমায় দেখে স্থির হ'য়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল— কি বলে যে সেদিন সে এই রাজ-অতিথিকে আহ্বান কর্‌বে কিছুই যেন স্থির কর্‌তে পার্‌লে না। তার গভীর বিস্ময়কে গভীরতম

করে আমি যখন বল্‌লুম, পটল, এক গেলাস জল দাও ত শান্তভাবে বল্‌লে, কি কর্‌বেন? আমি বল্‌লুম, খাব। খাবেন?—আমাদের ছোঁয়া জল! কেন, তোমাদের ছোঁয়া জল কি এই প্রথম খাব না কি! ঐ যে তোমাদের ঐ ধারের পুকুরটা রয়েছে, বর্ষার দিনে ওইটাই ত গ্রামের সকলের প্রয়োজন মেটায়। তখন যদি তোমাদের ঐ ছোঁয়া জলে আমার মা-বাপের তৃষ্ণা মিট্‌তে পারে, আজ আমি এমন কি সৃষ্টিছাড়া ব্রাহ্মণ হ'য়ে উঠ্‌লুম যে সে জল তুমি আমায় দিতে পার না? সে ব্যাকুল হ'য়ে বল্‌লে, দেখুন, ও পাপ আমি কিছুতেই কর্‌তে পার্‌ব না। তার চেয়ে কাপড় ছেড়ে আমি একটা গেলাস মেজে দিচ্ছি, আপনি নিজে পুকুর থেকে জল তুলে খান্।

তাহলে দেখ্‌চি, জল খাওয়াটা এখন আমাকে স্থগিত রাখ্‌তে হ'লো। ভাল কথা, তোমার বাবা কোথায়?

বাবা গেছেন শিববাবুর মাঠের ধান তুলে আন্‌তে।

আমি বল্‌লুম, আমি যে খবর পেলুম, তোমার বাবার জ্বর হয়েছে, উঠ্‌তে পারেনি?

সে বল্‌লে, খবরটা মিথ্যে শোনেন্‌নি, কিন্তু শুয়ে থাকার ভাগ্য যে করে আসেনি, তার এ ছাড়া আর কি উপায় আছে বলুন ত?

তাই ত! এত বড় সত্যটা কি করে যে আমি ভুলে গেছ্‌লুম তাই এখন ভাবি। যাদের ঘরে দু'বেলার খাবার একসঙ্গে জোগাড় থাকে না, তাদের যে মহামারীতেও শুয়ে থাকার অধিকার নেই, এটা যেন আমি ভুলেই গেছ্‌লুম! তারপর হঠাৎ প্রশ্ন কর্‌লুম, আচ্ছা সেদিন চীৎকার শুনে তুমিই বুঝি প্রথমে ছুটে গিয়েছিলে?

হাঁ! কিন্তু আপনি আর কখনও আলো না নিয়ে বেরুবেন না। আজও ত দেখ্‌চি, সঙ্গে আপনার আলো নেই, অথচ এই বাঁশ বাগানের মধ্যে দিয়ে যাবেন।

হাঁ, তা' ত যেতেই হবে, কিন্তু এখন আমার যাবার বিশেষ তাড়া নেই। তার চেয়ে তুমি ঐ মাদুরটা পেতে দাও—আমি একটু বসি।

সে একটু ইতস্ততঃ করলে, তারপর ঘর থেকে একটা নূতন পিঁড়ি এনে বল্‌লে, এটাতে আপনি বস্‌তে পারেন। কিন্তু রাত হ'য়ে যাচ্ছে—বাড়ীতে আপনার ভাব্‌বে যে!

আমি সে কথার কোন প্রত্যুত্তর করলুম না। পকেট থেকে দশটা টাকা মেজের উপর রেখে বল্‌লুম, এই টাকা কয়টি তুমি তুলে রাখ পটল।

সে বল্‌লে, কেন বলুন ত? এ বুঝি আমাদের পুরস্কার? নয়, ঠিক কি না বলুন ত?

না—তা'—নয়। শুন্‌লুম তোমার বাবার অসুখ করেছে তাই—

ওঃ বুঝেছি! কিন্তু এ টাকা ত আমি নিতে পারব না।

কেন? এ টাকা ত আমি ইচ্ছে করেই দিচ্চি—তুমি ত আমার কাছ থেকে চেয়ে নিচ্চ না।

তা' হ'তে পারে! কিন্তু একজনের দেওয়ার ইচ্ছেতেই ত আর একজনের নেওয়ার ইচ্ছে হ'তে পারে না।

না, তা' হয় ত পারে না! কিন্তু—

কিন্তুর কিছু নেই জান্‌বেন। আমরা গরীব—এই টাকা

কয়টায় আমাদের উপকারও বড় কম হবে না, কিন্তু আপনি বাড়ী এসে টাকা দিয়ে গেলে লোকে কি ভাব্‌বে বলুন ত?

আমি অবাক হ'য়ে বল্‌লুম, আমার টাকা দেওয়ায় লোকের কি ভাব্‌বার আছে বল ত?

সে শান্ত এবং সংযতভাবে বল্‌লে, দেখুন, আমরা ছোটজাত—আমাদের লোকে যা কিছু বলুক তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু আপনি কেন মিথ্যা দুর্ণামের ভাগী হবেন বলুন ত! যেদিন শুন্‌বেন, আজ যেখানে এতক্ষণ কাটিয়ে গেলেন, এর ধূলা মাটী সব কলঙ্কের কালিমায় কালো হ'য়ে গেছে, সেদিন ত আপনি আমায় ক্ষমা কর্‌তে পার্‌বেন না! আমি ভারি আশ্চর্য্য হচ্ছি, এত বড় একটা খবর এতদিন আপনার কাণে পৌছয়নি! অথচ, আপনার বাপই ত শুন্‌তে পাই, আমাদের নির্ব্বাসন কর্‌বার ব্যবস্থা করেছেন। কথার মাঝে সে হঠাৎ হেসে উঠে বল্‌লে, সেদিন কিন্তু আপনার বাবা বড় জব্দ হ'য়ে গিয়েছিলেন! আপনি ছেলে—কি কর্‌বেন! নইলে, অতখানি সময় কি করে যে তিনি এখানে বসে ছিলেন, তাই আমি ভাবি! শুধু কি তাই! যাবার সময় তিনি আমাদের কত আশীর্ব্বাদ করে গেলেন; কিন্তু আমি জান্‌তুম, এ ভুল ভাঙ্‌তে তাঁর একটা দিনও লাগ্‌বে না—হ'লোও তাই!

একটা ঘুমন্ত লোককে সজোরে তার হাত দু'টো ধরে টেনে তুল্‌লে সে যেমন কিছুক্ষণের জন্য ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে—ভাল-মন্দ কিছু যেমন হঠাৎ উপলব্ধি কর্‌তে পারে না—আমার অবস্থাও কতকটা সেই রকম হ'লো। পটল তা' বুঝতে পেরে বল্‌লে আমার সব কথা আপনি হয় ত বুঝ্‌তে পার্‌বেন না, কিন্তু রাত হ'য়ে

যাচ্ছে আপনি বাড়ী যান্—আমি একটা আলো এনে দিচ্চি। এই বলে সে চলে গেল; আমি কিন্তু বোবার মত সেখানে বসে রইলুম। তারপর সে ফিরে এলে তাকে বললুম, পটল, আমি আর যাই হই আমাকে বিশ্বাস করে কেউ কখন ঠকেনি, এবং তুমিও ঠক্‌বে না তা' আমি বলে দিচ্চি। আজ একটা কথা আমায় পরিষ্কার করে বল—এ সব কথার মানে কি? এমন ভাবে কথা কইতে শিখ্‌লেই বা কি করে? আমার যতদূর মনে হয়, আগে তোমায় কখনও এখানে দেখিনি, তারপর একদিন তোমায় দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখে জিজ্ঞাসা করে জানলুম, তুমি ভূতোর মেয়ে—মামার বাড়ীতে এতদিন থাকতে—এখন এখানে এসেছ। সত্যি বল্‌ছি, আর কোন কিছুই আমার তোমার সম্বন্ধে জান্‌বার প্রয়োজন হয়নি।

সে আমায় বাধা দিয়ে বলে উঠ্‌ল, এ সব জেনেই বা আপনার কি লাভ হবে? গ্রামের যাঁরা ভদ্দরলোক তাঁরা যখন স্থির করেছেন আমার স্বভাব চরিত্র অত্যন্ত মন্দ, তখন আপনি আর আমার কি কর্‌তে পারেন বলুন? আপনি না হয় বাড়ীতে গিয়েই কারুকে জিজ্ঞাসা করে জান্‌বেন, এবং আমার বিশ্বাস, কেউ কোথায় এতটুকু কার্পণ্য কর্‌বে না।

না। তাতে আমার প্রবৃত্তি নেই, বরং আপনার নিজের মুখ থেকেই আমি শুন্‌তে চাই।

আমার নিজের মুখ থেকেই আমার কলঙ্কের কথাটা শুনে যেতে চান্? কিন্তু তাতে আমার আপত্তি আছে।

আমি বলে উঠলুম, থাক্ থাক্—তোমায় আমি ব্যথা দিতে চাই না। কিন্তু তোমায় ছোট মনে কর্‌তে কোথা যেন আমার বাধ্‌বে,

বরং এইটেই আমার মনে হ'চ্চে, যারা তোমায় ছোট বলে রায় প্রকাশ করেছেন তাঁরা তোমায় চিন্‌তে পারেন নি।—আর সবাই কি সব জিনিষ চিন্‌তে পারে! ঐ যে কয়লার সঙ্গে মাঝে মাঝে যে বস্তুটা লুকিয়ে থাকে তাকে কি সবাই চিন্‌তে পারে? এই বলে আমি উঠে দাঁড়ালুম। সে বল্‌লে, অন্ধকারে আলো না নিয়ে যাবেন না। পিছন ফিরে একবার তাকিয়ে আমি তার বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলুম। সে ছুটে এসে আমার হাতে একটা হ্যারিকেন্ দিয়ে বল্‌লে, এটা নিয়ে যান্—আমার কথা শুনুন্।

আমি বল্‌লুম, না। এটা আমি বইতে পারব না; এই একটু পথ, আমি এখুনি চলে যাব।

তার গলার স্বর ভারি হ'য়ে উঠ্‌ল। সে বল্‌লে, সেদিনের পথটাও ত এম্‌নি 'একটু' ছিল, কিন্তু সেদিন কেন রক্ষা পেলেন না? আপনার পায়ে পড়ছি—আপনি অনর্থক আমায়—সে আর কিছু বল্‌তে পার্‌লে না।

আমি সে মিনতি অবজ্ঞা কর্‌তে পার্‌লুম না। কিন্তু কেন? আমার মঙ্গলের জন্য তার এ ব্যাকুলতা কেন?

অন্ধকার পথটা শুধু এই প্রশ্নটাই বার বার মনে হ'তে লাগ্‌ল।

## তিন

সকালবেলায় হ্যারিকেন্‌টা দিয়ে আস্‌বার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়লুম। এত তাড়াতাড়ি হয় ত সেটা ফিরিয়ে দেবার প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু না দিয়ে আমার স্বস্তি ছিল না। মা বল্‌লেন, আজ একবার তোকে নতিপপুরে যেতে হবে—উনি বলে গেছেন। আমি বল্‌লুম, আচ্ছা, এই আলোটা আমি ভূতোদের বাড়ী দিয়ে আস্‌চি। মা প্রশ্ন কর্‌লেন, এ আলো তুই পেলি কোথা থেকে? আমি বল্‌লুম, এটা কাল আমি তাদের বাড়ী থেকে নিয়ে এসেচি—আস্‌তে রাত হ'য়ে গেল—সঙ্গেও আলো-টালো কিছু ছিল না। মা বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লেন, আর কি তুই আলো নেবার যায়গা পেলি না? শুন্‌চিস্‌ কর্ত্তা ওদের চলে যেতে হুকুম দিয়েছেন,—তুই গেলি ওদের বাড়ী থেকে আলো আন্‌তে!

আমি বল্‌লুম, ওরা উঠে যাবে কেন মা? কৈ, এ কথা ত তুমি আমায় বলনি?

এ আবার তোকে কি বল্‌বার আছে? পাড়ার সবাই ওর ওপর চটে গেছে। আর, লোকেরই বা দোষ কি? ওদের নিজেদের

সমাজেই যখন ঐ ছুঁড়ীটার বিয়ে হ'চ্চে না,তখন একটা কিছু ঘটেছে বৈকি !

একটা অদম্য কৌতূহলকে দমন করে আমি অত্যন্ত তাচ্ছিল্য-ভরে বল্লুম, হাঁ মা, ওর স্বভাব-চরিত্র বুঝি ভাল নয় ?

মা বল্লেন, লোকে ত তাই বলে। ওর মামার বাড়ীতে কি একটা হয়েছিল তাই ত ও এখানে পালিয়ে এসেছে। নইলে, মামারা অত বড়লোক—এতদিন মানুষ কর্‌লে,—আজ তবে খোঁজ করে না কেন ? বাপের ত অবস্থা এই !

আমি বল্লুম, আচ্ছা মা, তুমি কি মনে কর এ সব সত্যি ? এমন ত হ'তে পারে কেউ হয় ত মিথ্যা করে এ দুর্ণাম রটিয়েছে।

মা বিরক্ত হ'য়ে বল্লেন, তা' অত জানিনে বাপু—মিথ্যা হোক্, সত্য হোক্, আমাদের ত পাঁচজনকে নিয়ে থাক্‌তে হবে সবাই যখন ওকে দোষ দিচ্চে তখন একটা কিছু নিশ্চয়ই আছে। আর ওরা হ'লো ছোটজাত—ওদের আবার ধর্ম্ম !

তা' ঠিক্ ! ছোট জাতের আবার ধর্ম্ম ! তাদের আবার সতীত্ব ! আমি মুখটা বুজে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলুম। পটল তখন একটা মাটীর পাত্রে খানিকটা গাদা নিয়ে তাদের উঠান নিকচ্ছিল ; আমায় দেখ্‌তে পেয়ে সে বল্লে, কাল রাত্রে কি আপনি এইটের জন্যে ঘুমুতে পারেননি না কি ? কাপড়-চোপড় সব নোংরা, আপনাকে একটা বস্‌বার আসন দেব, এমন উপায় নেই।

আমি বললুম, বস্‌বার আসন না পেলেও আমি ব'স্‌ব, মেজের উপর বসা আমার অভ্যাস আছে।

সে গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লে, কাজ যখন হ'য়ে গেছে, তখন এখানে থাক্‌বার আপনার প্রয়োজন কি ?

কোথায় কার কি প্রয়োজন ক'টা লোকে তা' বুঝ্‌তে পারে ? কিন্তু সে ভাব গোপন করে আমি বল্‌লুম, তোমাদের এ বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হবে, তবে এর জন্যে আর এত পরিশ্রম কেন ?

সে বেশ নির্ব্বিকারভাবে বল্‌লে, যে ক'টা দিন আছি সে ক'টা দিন ত থাকতে হবে। কোন জিনিষটাই ত চিরদিন থাকে না, কিন্তু তাই বলে মানুষের লোভের কি আর অন্ত আছে চাটুয্যে মশাই ?

আচ্ছা পটল, এ বাড়ী ছেড়ে যেতে তোমাদের কি এতটুকু কষ্ট হবে না ? তুমি কেন একবার সকলের কাছে তোমার কথা খুলে বল না ?

সে বল্‌লে, এতে আমার লজ্জা বাড়বে বই এতটুকু কম্‌বে না, আর আমার নিজের দিক থেকেই কী বল্‌বার আছে বলুন ? সকলের এতদিনের পরিশ্রমটাকে কি আমি শুধু একটা 'না'র জোরে ভেঙে দিতে পার্‌ব ? সে মিথ্যা চেষ্টা কর্‌বার আর আমার প্রবৃত্তি নেই।

আচ্ছা, তোমার বাবারও কি এই মত ?

সে প্রথমটা চুপ করে রইল, তারপর অন্যমনস্কভাবে বল্‌লে, এই কুঁড়েটা ছেড়ে যেতে হবে শুনে বাবার যেন মৃত্যু যন্ত্রনা আরম্ভ হয়েছে। সেদিন তিনি গ্রামের সকলের নিকটেই কেঁদে গিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু এত বড় অন্যায় তাঁরা কেউ প্রশ্রয় দিতে চাইলেন না।

আমি বলি, এর কি কোন প্রতিবিধান করা যায় না ?

সে বলে উঠ্‌ল, আপনার পায়ে পড়ি, যা হবার নয় তার ব্যর্থ চেষ্টায় আপনি নিজেকে ছোট কর্‌বেন না।

কিন্তু তুমি ত ছোট নও !

এই আমার যথেষ্ট চাটুয্যে মশায়, আজ সংসারে কেবল দু'জন আমায় ছোট মনে কর্‌তে পারেনি—সে আপনি আর আমার বাবা। কিন্তু আপনি যে কেন এ ভুল কর্‌লেন তা' আমি বুঝ্‌তে পার্‌চি না। হয় ত এ ভুল একদিন ভাঙ্‌বে—সেদিন বুঝ্‌বেন আমায় বিশ্বাস করা আপনার উচিত হয়নি।

আমি বল্‌লুম, জীবনে ভুল ত বড় কম করিনি, পটল ! আজ না হয় সেই সংখ্যায় আর একটা যোগ হ'য়ে যাবে। কিন্তু তোমায় অসতী আমি কোন দিনই ভাব্‌তে পার্‌ব না।

একটা করুণ দৃষ্টিতে সে আমার মুখের উপর চেয়ে রইল,—আমি তার ঐ দৃষ্টির মুগ্ধ আলোকে যেন ডুবে গেলুম !

## চার

সেটা ছিল পূর্ণিমার রাত্রি। আমার বেশ মনে পড়ে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছিল আমি তখন পুকুরপারে এসে অকারণে বসেছিলুম। এটা এমনি নূতন যে আমার নিজের কাছেই কেমন যেন অদ্ভুত ঠেক্‌ছিল। চিরদিন চাঁদের আলোর চেয়ে ঘরের মধ্যে 'এ্যাক্‌টীং' করাটাই ছিল আমার বিশেষ স্বভাবসঙ্গত, কিন্তু সে রাত্রে কেন যে এম্‌নি অদ্ভুত খেয়াল উঠেছিল, তা' তিনিই জানেন যিনি মানুষের মনের সকল রহস্য উদ্‌ঘাটন কর্‌তে পারেন।

একলা বসে বসে আবোল-তাবোল কত কিই-ই ভাব্‌ছিলুম! মনে হচ্ছিল, ওর সঙ্গে যেন আমার কতদিনের পরিচয়, যেন কত যুগ আমি ওর সঙ্গেই ছিলুম—আজ হঠাৎ পৃথক হ'য়ে পড়েছি! একটা চাপা কান্না আমার মনের মধ্যে অনেকক্ষণ থেকে যেন গুমরে উঠ্‌ছিল, হঠাৎ সেটা এম্‌নি ক্ষেপে উঠ্‌ল যে কিছুতেই আর আমি তাকে সাম্‌লাতে পার্‌লুম না। চোখের জলে যে এত শান্তি তা' আমি আজ এই প্রথম অনুভব কর্‌লুম। এইজন্যই বোধ করি শিশুর জন্ম মুহূর্ত্তে সে কাঁদে! তারপর যখন সে বুঝ্‌তে পারে এ

পৃথিবীটার সঙ্গে সত্যিই তার কোন সম্পর্ক নেই তখন সে আর কাঁদ্‌তে পারে না—নিশ্বাস যেন তার রুদ্ধ হ'য়ে যায়! এম্‌নি সব দার্শনিক চিন্তায় রাত্রি যখন বেড়ে উঠ্‌ল, আমি তখন শ্রান্তিতেই শুধু সেখান থেকে উঠে এলুম। কিন্তু আমার অবসাদগ্রস্ত মন কিছুতেই আমায় ঘুমুতে দিলে না। এম্‌নি নিদ্রা ও জাগরণের মধ্যে কতক্ষণ যে আমার কেটে গেল তার কোন কিছুই আমার ধারণা ছিল না। হঠাৎ 'বাবু' 'বাবু' বলে কে যেন ভাঙা গলায় আমার জানলার উপর আঘাত করতে লাগ্‌ল, আমি ত্রস্তভাবে উঠে পড়ে বাইরে এসে দেখ্‌লুম, ভুতো। সে আমার পা দু'টো জড়িয়ে ধরে পাগলের মত কাঁদতে কাঁদতে বল্‌লে, একটা উপায় করুন বাবু—পটলের আমার ভেদ-বমি হচ্চে। বিরাজ ডাক্তারকে ডাক্‌তে গেছ্‌লুম বাবু—সে কিছুতেই আস্‌তে চাইলে না।

কেন যে বিরাজ ডাক্তার আস্‌তে চাইলে না, সেটা বুঝ্‌তে আমায় বিশেষ কিছু ভাব্‌তে হ'লো না। কিন্তু কি করি? আমার শত অনুরোধেও যে কেউ ভুতোর বাড়ী পদার্পণ কর্‌বে না, সে খবর ত আমার অজানা ছিল না! তবুও তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্‌লুম, তুমি বাড়ী যাও ভুতো, আমি এখনি যাচ্ছি। ভুতো তেম্‌নি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌লে, এ বিপদে আপনি ছাড়া আর আমার কেউ নেই বাবু! পটল বল্‌লে, বাবা, তাঁকে একবার খবর দাও—তিনি নিশ্চয় আস্‌বেন।

ভুতোকে বাড়ী পাঠিয়ে আমার বহু পুরাণো হোমিওপ্যাথি ব্যাক্সটা আজ আলমারীর একটা কোন্‌ থেকে খুঁজে বার কর্‌লুম। বেরুবার সময় পা দু'টো যেন বাঁশ পাতার মত দুল্‌তে লাগ্‌ল। মনে

মনে বল্‌লুম, ভগবান, কোনদিন তোমায় ভাব্‌বার অবসর পাইনি, আজ বড় ব্যথায় তোমায় স্মরণ করে যাচ্চি।

প্রায় দু'ঘণ্টা প্রাণপন চেষ্টার পর যখন রুগীর কোন উপকারই কর্‌তে পার্‌লুম না তখন ভুতো কেঁদে উঠে বল্‌লে, কি হবে বাবু?

কি যে হবে সেটা ভাবা বিশেষ কিছু শক্ত ছিল না, কিন্তু পিতার মুখের সাম্‌নে তার কন্যার শেষ অবস্থাটা ইঙ্গিত কর্‌বার আমার শক্তি ছিল না। কিন্তু আমার মিথ্যা সান্ত্বনা আর একজনকে ফাঁকি দিতে পারেনি। পটল আমার পায়ের উপর তার মাথাটা লুটিয়ে দিয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তোমার অপমান কর্‌তে চাই না, কিন্তু আমার শেষ সময়ের এই কথাটা বিশ্বাস কর—কখন কোনদিন আমি কোন অন্যায় করিনি। এই বলে আমার পা দু'টো সে তার ক্ষীণ হাত দু'খানি দিয়ে প্রাণপন শক্তিতে আঁকড়ে ধরে রইল। একটা প্রচণ্ড হাহাকারে আমার বুকের ভিতরটা যেন ফেটে যাবার মত হ'লো—আমি চীৎকার করে উঠ্‌লুম, পটল? হায়, কে উত্তর দেবে? পোড়ারমুখী যে আমাকেই তার শেষ সাক্ষী রেখে চলে গিয়েছে!

তখন আকাশের অন্ধকার গাঢ় হ'য়ে উঠেছে,—আর সেই অন্ধকারের মধ্যে শুধু আমরা দুটী নির্ব্বাক প্রাণী এক চির-নির্ব্বাক হতভাগিনীকে ব'য়ে নিয়ে গেলুম তার শেষ ক্রীয়া কর্‌তে!

সকালবেলায় যখন বাড়ী ফিরে এলুম তখন গ্রামের লোকে আমাদের চণ্ডীমণ্ডপটা একেবারে জমাট হ'য়ে উঠেছিল। বাড়ীতে ঢুক্‌তে যাচ্ছি বাবা ছুটে এসে দরজা আট্‌কে বল্‌লেন, খবরদার, এর বিহিত না হওয়া পর্য্যন্ত তুমি বাড়ী ঢুক্‌তে পার্‌বে না। আমি তাঁর

মুখের দিকে একবার চোখ তুলে চেয়েই যে পথে এসেছিলুম সেই পথে ফিরে গেলুম। তখন নদীর ধারে আমাদের ছোট ডুঙ্গীটা বাঁধা ছিল,—ছেলেবেলার দুষ্টুমীটা আমার বড় উপকার করলে! তারপর একখানা ছেঁড়া কাপড় মাত্র সম্বল করে যখন আমি কলকাতার পথে এসে দাঁড়ালুম, তখন সে আমার আর এক অবস্থা!

এখন কত বৎসর কেটে গেছে—এত বড় শহরে দু'মুঠো অন্নসংস্থান কোন রকমে করে নিয়েছি, কিন্তু কোনদিন নিজের সেই পল্লীর দিকে মনটা আর ফেরাতে পারিনি! সেদিন কোন পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল—চিনতে পারলে না! কেন পারবে?—আর কি আমি সে কেবলা আছি!

# দীপ-শিখা

## এক

ক্ষিতীশের বয়স তখন ঠিক তেরো, যখন তার মা তাকে ফেলে চলে গেলেন। কবে কত বয়সে যে বাপের সঙ্গে তার শেষ দেখা হয়েছিল, সে কথা তার মনে নেই। শুধু মা যখন তাঁর সম্বন্ধে মাঝে মাঝে গল্প কর্‌তেন, তখন একটী জীর্ণ ছিন্ন স্মৃতির মধ্যে দিয়ে এমন একটী মূর্ত্তি সে কল্পনা করে নিত, যাঁকে আর একবার দেখ্‌বার জন্যে তার সমস্ত মনটা ছুটে বাইরে আস্‌তে চাইত। কিন্তু কল্পনা কোনদিন বাস্তব হ'য়ে ফুটে উঠে না, তাই ক্ষিতীশের কল্পনাও তাকে পীড়িত করা ব্যতীত আর কিছুই করে উঠ্‌তে পার্‌ত না।

কিন্তু মা যেদিন তার সকল বন্ধন ছিন্ন করে তাঁর স্বামীর কাছে চলে গেলেন সেদিন সে স্থির কর্‌লে, সে আর যাই

করুক, মায়ের শেষ ইচ্ছাকে সে কোনদিন অবমাননা করবে না; যেমন করেই হোক্ তাঁর মর্য্যাদা বাঁচিয়ে সে তার জীবনের পথে এগিয়ে চল্‌বে।

মর্‌বার সময় মা তার দু'টী হাতে ধরে বলেছিলেন, বাবা, আর যাই করিস্—জীবনে কখন উচ্ছৃঙ্খল হোস্‌নি। সেই জীবন মৃত্যুর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে ক্ষিতীশ সে ইচ্ছায় সম্মতি দান করেছিল।

জননী যে অন্তিম শয্যা হইতে সন্তানকে কি ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, ক্ষিতীশ তাহা ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিল। তার জ্ঞান হওয়া অবধি এই মা'টী ছিল তার শুধু মা নয়—পরম বন্ধু। সন্তানের মঙ্গল কামনা করিয়া সকল বিষয়েই তিনি তাহার সহিত আলোচনা করিতেন। মিথ্যা লজ্জার আবরণে কোনদিন কোন কথাই তিনি তাহার নিকট হইতে লুকাইয়া রাখেন নাই। ক্ষিতীশ যে তাঁহার কোল ছাড়িয়া একটু একটু করিয়া যৌবনের পথে ছুটিয়া চলিয়াছে, আর যে তাহাকে প্রকৃতির বিরুদ্ধে শাসন করিয়া আট্‌কাইয়া রাখা যাইবে না—এ কথা তিনি মা হইয়াও বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং ইহার জন্য তাঁহার সতর্কতার আর অবধি ছিল না!

এম্‌নি মায়ের সন্তান হইয়া এই অল্প বয়সেই ক্ষিতীশ অনেক কিছু শিখিবার সুবিধা পাইয়াছিল। এবং যাহাতে সে শিক্ষা তাহার ব্যর্থ না হইয়া যায়, তাহার জন্য প্রতিমুহূর্ত্ত সে সজাগ হইয়া থাকিত।

মা-হারা সন্তান হইয়া দিনকতক সে বড়ই কাতর হইয়া পড়িল। তাহার কেবলি মনে হইত এ জীবনের সুখ-শান্তি

তাহার চিরদিনের মত ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। তাই নির্জ্জনতার নিস্তব্ধ আশ্রয়ে অবসর পাইলেই, সে ছুটিয়া গিয়া তাহার হৃদয়-জ্বালা কতক পরিমাণে উপশম করিত। কিন্তু যে বিরাট শূন্যতা তাহার সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া খাঁ খাঁ করিত, তাহা সে কোনরূপেই পূর্ণ করিতে পারিত না।

এম্‌নি করিয়া দুই বৎসর কাটিয়া গেল। কিন্তু কোন বস্তুই সংসারে চিরস্থায়ী নয়, তাই যেদিন ক্ষিতীশ আবার তাহার বন্ধুদের সহিত হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল তাহাতে কেহই এতটুকু বিস্ময় প্রকাশ করিল না। ইহাই সংসারের গতি!

# দুই

সেদিন শীতের রাত্রি। টিপ্ টিপ্ করিয়া সারাদিন বৃষ্টি পড়িয়া শীতের শক্তিকে আরও প্রবল করিয়া তুলিয়াছিল ; মোটা একটা লেপ গায়ে দিয়া ক্ষিতীশ চুপ করিয়া শুইয়াছিল। এম্নি অসময়ে সে কোনদিন শুইয়া থাকে না, কিন্তু সেদিন কেমন যেন আর তাহার কোন কর্ম্মেই উৎসাহ ছিল না। একখানা বইয়ের পাতা খুলিয়া সে একটু পড়িতেও চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু কিসের একটা অবসাদ আসিয়া তাহার সে সাধু ইচ্ছাকে ব্যর্থ করিয়া দেওয়ায়, সে আর অনর্থক তাহা লইয়া বৃথা চেষ্টা করে নাই। তাহার অলস মস্তিষ্কের মধ্যে তখন এলোমেলো চিন্তার ঝড় বহিতে লাগিল। এম্নি চিন্তার মধ্যে যখন তাহার জননীর শেষ কথাগুলি তাহার মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিল, অম্নি চাবুক-খাওয়া ঘোড়ার মত সে বিছানা হইতে সজোরে লাফাইয়া উঠিল—সে যেন কি একটা চিন্তা করিয়া ফেলিয়াছে যাহা তাহার জননীর শেষ ইচ্ছার সম্মান রক্ষা করে নাই !

বাহিরের বারান্দায় আসিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।

রাত্রি অধিক হইয়াছে, ক্ষিতীশ তখনও খাইতে আসে নাই দেখিয়া মনোরমা তাহাকে ডাকিতে আসিলেন। বৌদিদিকে কাছে আসিতে দেখিয়া ক্ষিতীশ কহিল, আজ আর আমি কিছু খাব না বৌদিদি, ভাল লাগ্‌ছে না।

কথাটা যেন মনোরমা বিশ্বাস করিতে পারিল না, তাই কাছে আসিয়া কপালে হাত দিয়া শরীরের উত্তাপ পরীক্ষা করিল। কৈ না, কিছুই ত হয়নি, চল খাবে চল। বলিয়া সে একরকম জোর করিয়াই তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল।

গরম গরম লুচি মনোরমা ভাজিয়া দিতে লাগিল, আর ক্ষিতীশ তাহাই এক একখানি করিয়া নিঃশেষ করিতে লাগিল। কড়াখানা নীচে নামাইয়া মনোরমা কহিল, ঠাকুরপো, এতখানি ক্ষিদে পেটে করে তুমি এতবড় রাতটা কাটিয়ে দিতে! আচ্ছা, সত্যি করে বল ত, কেন খাবে না বল্‌ছিলে?

সত্যি বল্‌ছি কেমন যেন ভাল লাগ্‌ছিল না।

কিন্তু এত ঠাণ্ডায় বারাণ্ডায় দাঁড়িয়েছিলে কেন?

তারও বিশেষ কোন কারণ নেই।

তা' কি হয় ঠাকুরপো, এত লেখাপড়া শিখেছ আর এটা জান না যে কারণ ছাড়া কার্য্য হয় না।

এত লেখাপড়াও শিখিনি বৌদি,' আর তোমার মত এত বিচার করতেও শিখিনি।

মনোরমা আরও খানকতক লুচি ভাজিয়া লইয়া কহিল, দেখ ঠাকুরপো, কৃপণের ধনের মত যে বস্তুটী তুমি তোমার নিজের

মধ্যে লুকিয়ে রাখতে চাইছ তা' আমি জোর করে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চাইনে, কিন্তু—

মনোরমার কথা শেষ হইতে না হইতে ক্ষিতীশ বলিয়া উঠিল, কিন্তু চেষ্টাও ত বড় কম ক'চ্ছনা বৌদি'। মনোরমা শান্তভাবে কহিল, কি জান ঠাকুরপো, যতদিন মা বেঁচে ছিলেন ততদিন তোমার সম্বন্ধে আমার কিছু জান্‌বার প্রয়োজন হয়নি; কিন্তু এখন ত আর আমি চুপ করে থাক্‌তে পারিনে, আজ তোমার ভাল-মন্দ সব যে আমাকেই দেখে বেড়াতে হবে। বাড়ীর বড়-বৌ হওয়া ত সোজা কথা নয়!

ক্ষিতীশের চোখদু'টী জলে ভরিয়া উঠিল। সে কহিল, তোমার পা ছুঁয়ে বল্‌ছি বৌদি', তোমাকে ব্যথা দেওয়া আমার উদ্দেশ্য ছিল না।

মনোরমা তাড়াতাড়ি তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিলেন, এবং পরম স্নেহে নিজের আঁচল দিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া দিলেন।

এম্‌নি করিয়া ক্ষিতীশের দিন কাটিতে লাগিল। বৌদিদির স্নেহের আশ্রয়ে থাকিয়া জননীর অভাব সে আর অনুভব করিতে পারিত না। মনোরমাও এই দেওরটীকে তার মাতৃহৃদয়ের সমস্ত স্নেহের সম্পূর্ণ অধিকারী করিয়া তাহার কর্ম্মহীন জীবনের অলস মুহূর্ত্তগুলি একরকম করিয়া কাটাইয়া দিতেন।

স্বামীর সহিত তাঁহার বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না। সংসারের গৃহকর্ম্ম ব্যতীত নারীর আকাঙ্ক্ষার যে আর কোন বস্তু থাকিতে পারে রাসবিহারী তাহা বুঝিয়াও বুঝিতেন না, তাই

## দীপ-শিখা

সারাদিন জমিদারীর কার্য্য দেখিয়া রাত দুপুরে ঘরে ফিরিয়া স্ত্রীর সহিত দু'টো একটা সাংসারিক কথা ব্যতীত আর কোনরূপ মধুর আলাপ করিয়া স্ত্রীর বা নিজের শান্তির ব্যাঘাত ঘটাইত না। ইহার জন্য মনোরমার দুঃখের অবধি ছিল না। কিন্তু দীর্ঘ দশ বৎসর স্বামীর সংস্পর্শে আসিয়া সে যখন চেষ্টা করিয়াও তাঁহার ধারণার এতটুকুও পরিবর্ত্তন করিতে পারিল না, তখন অনর্থক কলহ করিয়া সে নিজের জীবনকে আরও দুঃসহ করিয়া তুলিতে চাহিল না। সে স্থির করিল, সকলের স্বামী সমান হয় না। তাহার ভাগ্য-দেবতা যখন এই পুরুষটীর সহিত তাহার ভাগ্যটীকে জড়াইয়া দিয়াছেন তখন অনর্থক চেঁচামেচি করিয়া লাভ কি? স্বামী আর যাহাই হউন—তিনি স্বামী। সে যখন তাহাকে স্বামী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে তখন যেমন করিয়া হউক সে শ্রদ্ধা তাহাকে বজায় রাখিতেই হইবে। এই সত্যটা উপলব্ধি করিয়া সে স্বামীকে আর কখন কোন কিছুর জন্য বিরক্ত করিত না, এবং ভগবান যে তাহার স্বামীকে অন্য বিষয়ে দোষী করেন নাই, ইহার জন্য কৃতজ্ঞতায় তাহার সমস্ত হৃদয় ভরিয়া থাকিত।

একদিন বিকেলবেলায় মনোরমা তাহার ঘরের মধ্যে শুইয়া একখানি বাঙলা উপন্যাস পড়িতেছিল, ক্ষিতীশ ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

মনোরমা কহিল, ব'স।

'বসি' বলিয়া সে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

এইখানেই বোসনা, বলিয়া মনোরমা একটু সরিয়া শুইলেন।

শান্ত শিশুটীর মত ক্ষিতীশ বৌদিদির পাশে চুপটী করিয়া বসিয়া রহিল।

মনোরমা কহিল, কি ঠাকুরপো, কথা কইলে কি জরিমানা দিতে হবে না কি?

ক্ষিতীশ শুধু একটুখানি হাসিয়াই বৌদিদির প্রশ্নের উত্তর দিল। হটাৎ বইখানার দিকে নজর পড়িতে সে কহিল, এ বইটা কেন প'ড়চ বৌদি'? এটা ভাল নয়।

কি করে জান্‌লে?

ও আমি পড়েছি।

তাহলে আমিও এটা আগে পড়ে নিই, তারপর বিচার করা যাবে। না পড়ে ত আর বিচার করা যায় না।

সব জিনিসই কি নিজে পড়া চলে, অনেক স্থলেই পরের মতা-মত নিয়ে চল্‌তে হয়।

তাকে কিন্তু বিচার করা বলে না ভাই, তাকে বলে নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দেওয়া।

ক্ষিতীশ উত্তেজিত হইয়া কহিল, তাহলে কি তুমি বল্‌তে চাও, আমাদের যত 'প্রোফেসার' আছেন তাঁরা সবাই বোকা?

মনোরমা মাথার বালিশটা একটু টানিয়া কহিল, তা' আমি বল্‌তে চাই না, তবে পরের কথা শুনে যাঁরা ঠিক করে ফেলেন, এটা এমন, ওটা তেমন, তাতে কিন্তু তাঁদের বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না।

ক্ষিতীশ কহিল, সে যাই হোক্‌, এ বইটা যে খারাপ তা' আমি জোর করেই বল্‌তে পারি।

মনোরমা স্নিগ্ধহাস্যে কহিল, তুমি হয় ত পার, কেননা তুমি পড়েছ, কিন্তু আমি ত তা' পারি না।

এটা কিন্তু তোমার বড় বাড়াবাড়ি বৌদি'। এতখানি পড়েছ অথচ ভাল কি মন্দ কিছুই বল্‌তে পারছ না?

বল্‌তে ত অনেক কিছুই পারি, কিন্তু সত্যিকারের বল্‌তে হ'লে ভাল করে বিচার করে দেখ্‌তে হবে, নইলে বলার দিক থেকে সেটা মিথ্যা হ'য়ে যাবে।

তাই ব'লো, বলিয়া সে যেন রাগ করিয়া উঠিয়া পড়িল।

ব'সনা ঠাবুরপো, চল্‌লে যে?

নাঃ, আমার কাজ আছে।

কিন্তু কেন এসেছিলে তা' ত বল্‌লে না?

ক্ষিতীশ ফিরিয়া দাঁড়াইল, এবং এক ঝলক উচ্ছ্বসিত লজ্জা চাপা দিয়া সে কি একটা বলিতে চাহিল, কিন্তু শ্রোতার কানে তাহা আদৌ পৌঁছিল না।

ওঃ বুঝেছি, আমাকে দেখ্‌তে এসেছিলে, না?

একজন অতি বিশ্বস্ত আত্মীয়ের নিকট যদি কোন হারানো বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়, তাহার প্রশ্নে সে যেমন হঠাৎ কোন উত্তর দিতে না পারিয়া কেবল অপরাধীর মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, ক্ষিতীশের অবস্থাও কতকটা তদ্রূপ হইল; এবং কি বলিয়া যে ঘর হইতে পলাইয়া যাইবে কিছুতেই যেন তাহা স্থির করিতে পারিল না।

মনোরমা কহিল, ছিঃ ঠাকুরপো! পুরুষ মানুষ হ'য়ে এত লাজুক হ'লে কি চলে?

চলে না যে, ক্ষিতিশ তাহা বুঝিত, কিন্তু না হইয়াও যে তাহার উপায় ছিল না। এত বড় কঠিন সত্য যে এতটুকু রহস্যের মধ্য দিয়া বাহির হইতে পারে, ইহা সে কল্পনাই করে নাই। ছুটির দিনে দুপুরবেলায় সে শুইয়াছিল, কিন্তু চোখদুটা তাহার বড় অবাধ্য হইয়া উঠিল। দুরন্ত শিশু যেমন জননীর সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া তাহার লালফুলটার প্রতি পিট্‌পিট্ করিয়া চাহিয়া থাকে, তেম্‌নি করিয়াই যেন তাহারা বৌদিদির ঘরখানির প্রতি চাহিয়া রহিল; এবং প্রবল বাধা সত্ত্বেও যখন তাহারা এতটুকু পোষ মানিল না, তখন পৃথিবী জোড়া লজ্জার বোঝা লইয়াই তাহাকে বৌদিদির ঘরে প্রবেশ করিতে হইল; এবং তিনি যে সেই কথাটাই কেমন করিয়া ইঙ্গিত করিলেন, ইহা তাহাকে আকাশ-পাতাল জোড়া বিস্ময়ের মধ্যে নিমজ্জিত করিল। তাহার যতদূর স্মরণ হয় বৌদি'র সহিত কথাবার্ত্তায় কখন সে নিজেকে এতটুকু প্রকাশ করে নাই। একটা দুর্দ্দমনীয় লোভ যে ধীরে ধীরে তাহাকে বৌদি'র আশে-পাশে টানিয়া বেড়াইতেছিল, তাহা সে যেন নিজের কাছেই গোপন রাখিতে চাহিত। তাই পূর্ব্বের মত সে আর তাঁহার সংস্পর্শে আসিতে চাহিত না। কিন্তু মন যখন তাহার সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া দুপুর বেলায় তাঁহার কাছেই ছুটিয়া যাইবার জন্য আকুলি-বিকুলি করিতে লাগিল, তখন না যাইয়া তাহার কোন উপায় রহিল না। তাই মনোরমার কথাগুলা সে উপহাস বলিয়া উড়াইয়া দিতে না পারিয়া ইহার নিহিত সত্যের নিকট একেবারে ছোট হইয়া গেল।

## তিন

রাজার আইনে রাজদ্রোহী যেমন তাহার ছোট ঘরখানির মধ্যে বন্দী থাকে—বাহিরের সহিত তাহার যেমন কোন সম্পর্ক থাকে না, তেম্‌নি ভাবে ক্ষিতীশ তাহার ছোট ঘরখানির মধ্যে নিজেকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল—বিশেষ কারণ ব্যতীত সে আর বাহির হইত না। মনোরমা তাহার এই নূতন পরিবর্ত্তন দেখিয়া মাঝে মাঝে তাহাকে কত ঠাট্টা করিয়াছে কিন্তু ক্ষিতীশ কোনও কারণে এতটুকুও বিচলিত হয় নাই। কিন্তু দিনের পর দিন ক্ষিতীশ যখন তাহার এই ইচ্ছাকৃত কঠোরতা একটু একটু করিয়া বাড়াইয়া তুলিতে লাগিল তখন মনোরমা সত্যিই একটু ভয় পাইল।

একদিন ক্ষিতীশ খাইতে বসিয়াছিল, মনোরমা কহিল, ঠাকুরপো, তোমার হয়েছে কি?

ক্ষিতীশ কহিল, কিছুই নয়।

কিছুই নয় যদি তবে পালিয়ে বেড়াও কেন? আস, আর তাড়াতাড়ি দু'মুঠো খেয়ে নিয়ে নিজের ঘরের মধ্যে বসে থাক—কোনদিন কলেজে যাও, কোনদিন বা যাও না। এই রকম কি

তুমি আগে করতে— বল দেখি ?—আগে কত কথা কইতে, কত বই এনে আমায় দিতে, আজকাল ত খাবার সময় ছাড়া তোমার দেখাই পাবার যো নেই, তা' আবার কতদিন খেতেই আস না। সত্যি করে বল ত, তোমার হয়েছে কি ? আচ্ছা, আমার কোন ত্রুটি দেখেছ ?

তোমার ? বলিয়া সে যেন কথাটাকে ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিল।

মনোরমা কহিল, হাঁ আমার। এই ধর, খাবার-টাবার তেমন করতে পারি না, বা তেমন করে তোমায় যত্ন করতে পারি না। মা থাকতে এ সব ত তিনি নিজেই দেখতেন।

ক্ষিতীশ কহিল, তা', সত্যি ! কিন্তু এ দুটার ত আমার কোন-দিনই অভাব হয়নি। তোমার অতি বড় শত্রুও ত তোমায় এ দোষে দোষী করতে পারবে না।

শত্রু পারবে না বলেই যে আর কেউ পারবে না, এমন ত কোন কথা নেই।

না, তা' হয় ত নেই, বলিয়া কথার মাঝে সে কি একটা যেন খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কি ভাবছ, ঠাকুরপো ?

কি ভাবছি ? বলিয়া সে উন্মাদের মত চাহিয়া রহিল।

তুমি এ রকম করে কথা কইচ কেন ঠাকুরপো ? তোমার হয়েছে কি বলবে না ?

হাঁ বলব, বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ঠাকুরপো ?

কি ?

মনোরমা অতি ভয়ে ভয়ে কহিল, তুমি কি নেশা করেছ ?

ক্ষিতীশ একবার তাহার মুখের প্রতি চাহিল, তারপর একটু হাসিয়া কহিল, তুমি কি আমায় এত ছোট মনে কর বৌদি' ?

মনোরমা সরিয়া আসিয়া ক্ষিতীশের হাতখানি ধরিয়া কহিল, ভাই, আমায় মাপ কর, আমি ভুল বুঝেছিলেম।

না বৌদিদি তুমিই ঠিক বুঝেছিলে—আমি নেশাই করেছি।

তবে ? এই যে বল্‌লে—

বহুদিনের ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি যেমন করিয়া তাহার সম্মুখস্থ দুষ্প্রাপ্য আহারের প্রতি হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে তেম্‌নি ভাবে ক্ষিতীশ মনোরমার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। নিদারুণ বিস্ময়ে মনোরমার মুখ হইতে একটা কথাও বাহির হইল না।

অল্পক্ষণ পরে নিজেকে সংযত করিয়া ক্ষিতীশ কহিল, বৌদি', আমায় দেখে তোমার কী মনে হয় ? মনে হয় না যে, আমি একটা ভীষণ শয়তান ?

মনোরমা ব্যস্তভাবে কহিল, না না, কখন না।

ক্ষিতীশ শান্তভাবে কহিল, তোমার কথাই যেন সত্যি হয় বৌদি'—ভগবানের কাছে সেই প্রার্থনা কর।

# চার

কঠিন নিমোনিয়া রোগে মনোরমা শয্যাগত। ডাক্তার আসিয়া কহিলেন, যদি 'নারসিং' ভাল হয় তবেই রোগী আরোগ্য হবে! মনোরমার স্বামী ভাইকে ডাকিয়া বলিলেন, শুনেচ, ডাক্তারবাবু কি বল্‌লেন? ক্ষিতীশ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে সে শুনিয়াছে। রাসবিহারী কহিলেন, জান ত ওসব আমি পারি না। ক্ষিতীশ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ, সে তা-ও জানে। তারপর স্থির হইল, ক্ষিতীশই রোগীর পরিচর্য্যার ভার লইবে।

প্রথম কয়দিন রোগী একবারে সংজ্ঞাশূন্য—দিন রাত কোথায় দিয়া গিয়াছে মনোরমার তাহা এতটুকু হুঁস ছিল না। পাশে বসিয়া সারা দিন-রাত ক্ষিতীশ ডাক্তারের কথানুযায়ী রোগীর সেবা করিয়াছে। একদিন ডাক্তার বলিল, আপনি একলা এত পরিশ্রম করলে, আপনার নিজের দেহও ত 'ব্রেক্' করতে পারে। ক্ষিতীশ একটু হাসিয়া কহিল, ভয় নেই ডাক্তারবাবু, দিনকয়েক রাত জাগ্‌লে আমার কিছু হবে না। ডাক্তার কোন উত্তর করিলেন না, মনে মনে হয় ত বলিলেন,

তোমাদের মত দু'চার জন না থাক্‌লে আমাদেরই বা চল্‌বে কোথা থেকে ?

ডাক্তারের ভয় মিথ্যা প্রমাণ করিয়া ক্ষিতীশ যখন মাসাধিক কাল সেবা করিয়া তাহার বৌদিদিকে আরোগ্যের পথে টানিয়া তুলিতে লাগিল তখন একদিন ডাক্তার বলিলেন, এ যাত্রা আপনিই আপনার বৌদিদিকে বাঁচিয়ে তুল্‌লেন।

সন্ধ্যার সময় ক্ষিতীশ খানিকটা সুরুয়া আনিয়া বৌদিদিকে খাওয়াইতে বসিল। মনোরমা কহিল, আমাকে বাঁচিয়ে তুল্‌তে তোমার এত চেষ্টা কেন ঠাকুরপো ?

ক্ষিতীশ কহিল, চেষ্টা হয় ত না-ও করতে পারতুম বৌদি', কিন্তু তোমার অসুখের পর উড়ে বামুনটার রান্না খেয়ে, চেষ্টা না করে আর পারলুম না। তুমি শিগগীর সেরে ওঠ বৌদিদি,' আবার তোমার হাতের রান্না খেয়ে বাঁচি।

আমার হাতের রান্না খাবে ভাই ! বলিয়া অসীম স্নেহে সে তাহার হাতখানি ধরিল। ধীরে ধীরে কহিল, আচ্ছা ঠাকুরপো, এ যাত্রা যদি না বাঁচ্‌তুম ?

ক্ষিতীশ কহিল, তা' জানি না বৌদি'। তোমাকে কি করে বাঁচাতে হবে সেই কথাটাই দিনরাত ভেবেছি ; তুমি না বাঁচ্‌লে কি হ'তো সেটা একদমই ভাবিনি।

মনোরমা নিরুত্তর ; শুধু শূন্য দৃষ্টিতে ঘরের একটা কোণের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ক্ষিতীশ কহিল, কি ভাব্‌ছ বৌদিদি ?

আস্তে আস্তে মনোরমা কহিল, তেমন কিছু ভাবিনি ভাই।

শুধু এইটুকু ভাব্ছি যে এত পরিশ্রম করে এমন সেবা কর্‌তে শিখ্‌লে কোথা থেকে? তোমরা ত এক মায়ের পেটের ভাই কিন্তু দু'জনের মধ্যে কি পার্থক্য! অথচ, তোমার এত কর্‌বারও কোন কথা নয়। তুমি যা করেছ ঠাকুরপো, তা' এ পৃথিবীর সকল দানকে ছাপিয়ে গিয়েছে। আজ আমার দুঃখ রাখ্‌বার যায়গা নেই বটে; কিন্তু আনন্দও যে এই ব্যথার ফাঁকে ফাঁকে একটু একটু নেচে বেড়াচ্চে না, এ ত আমি অস্বীকার কর্‌তে পারি না। এই যে বড় বড় দিনরাতগুলো আমার বিছানার পাশে বসে কাটিয়ে দিলে ভাই, কৈ একদিনের জন্যেও ত তোমার মুখে এতটুকু বিরক্তির ছায়া দেখিনি! তাই, যে পুরুষ অক্ষমতার উপরে তার সকল অপরাধ ন্যস্ত করে নির্ব্বিচারে রুগ্না স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে থাক্‌তে পারে, তারই ভাই বলে তোমায় স্বীকার কর্‌তে আজ আমার কোথায় যেন একটু বাধ বাধ ঠেক্‌ছে; কিন্তু একে অস্বীকার কর্‌বারও যো নেই—এম্‌নি ভগবানের লিখন!

ক্ষিতীশ অন্যমনস্ক হইয়া কথাগুলা যেন গিলিয়া খাইতেছিল, তাই কখন যে মনোরমা চুপ করিয়াছিল তাহা তাহার হুঁস ছিল না।

হঠাৎ ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া রাসবিহারী প্রবেশ করিলেন। কহিলেন, এখন ত অনেকটা ভাল আছে, আমি না হয়, দিনকতক একটু ঘুরে আসি। মহলে আবার একটা জমি নিয়ে বড় গোলমাল বেধেছে।

ক্ষিতীশ কহিল, আরও দিনকতক যাক্ না, বৌদি' আর একটু সেরে উঠ্‌লে তখন না হয় যাবেন?

প্রত্যুত্তরে ক্ষিতীশ কি একটা বলিতে গিয়া দেখিল মনোরমা সমস্ত মুখখানা তার গায়ের মোটা চাদরটা দিয়া একেবারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

ক্ষিতীশের নিকট ইহা কিন্তু অদ্ভুত ঠেকিল না। এই কয় বৎসরের মধ্যে সে তাহার বৌদিদির সম্বন্ধে অনেক কথাই ধারণা করিতে পারিয়াছিল। তিনি যে এই মিথ্যাকে চাপা দিয়া সকল অবস্থাকে অতিক্রম করিতে পারিবেন না, একদিন না একদিন এই মিথ্যার বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়া প্রচণ্ড জলস্রোত নদীর দুইকূল চুরমার করিয়া দিবে, ইহাই সে যেন কেমন করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল। কিন্তু এত বড় দুর্ঘটনা সে ভাই হইয়া ভাইয়ের বিরুদ্ধে নির্ব্বিঘ্নে কল্পনা করিতে পারে নাই। অথচ, যাহা এই মুহূর্ত্তে তাহার চোখের সম্মুখে ঘটিল তাহাকে 'কিছুই নয়' বলিয়াও সে উড়াইয়া দিতে পারিল না। আর যাহাই হউক মনোরমা যে সাধারণ স্ত্রীলোকের মত অকারণে যাহোক একটা কিছু করিয়া ফেলিবেন না, ইহা সে ভাল করিয়াই জানিত, এবং ইহাই যে সেই দুর্দ্দিনের কাল মেঘের মত সারাআকাশকে ঘনান্ধকারে আচ্ছাদিত করিয়া দিবে, ইহার চিন্তাতে তাহার সমস্ত শরীরটা যেন ভিতরে ভিতরে কাঁপিতে লাগিল—একটা কথাও সে ঠোঁট হইতে বাহির করিতে পারিল না। রাসবিহারী কিছুই লক্ষ্য করিলেন না। 'যেতেই যে হবে,' 'না গেলে যে চল্‌বে না' এম্‌নি দু-চারিটা কথা কহিয়া তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

সমস্ত ঘরটা নিস্তব্ধতার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল।

মুখের আবরণটা ঠেলিয়া ফেলিয়া মনোরমা কহিল, কেন তুমি ঠাকুরপো মিছামিছি অপমান হ'তে গেলে? আমার অসুখ আগে, না ওঁর কাজ আগে? এই যে এত বড় অসুখটা গেল, চাকুরি বজায় রাখার মত একবার 'কেমন আছ' জিজ্ঞাসা করা ছাড়া, কোনদিন কি ঘরের মধ্যে এসে একটু বসেছেন? আজ আমার মুখের কথা শুনে তুমি হয় ত অবাক হ'তে পার, কিন্তু সত্যি বলছি, আমার সমস্ত ধৈর্য্য যেন এইবার চুরমার হ'য়ে যাবার মত হয়েছে। এতদিন এরই বিরুদ্ধে আমি নিজে নিজে অনেক লড়াই করেছি এবং সকাল সন্ধ্যা ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করেছি যে, যে কটা দিন আছি ওঁর প্রতি আমি যেন শ্রদ্ধা না হারাই। কিন্তু সকল বস্তুরই একটা সীমা আছে ত! কি ঠাকুরপো, মাথাটা যে তোমার নুয়ে পড়্‌বার মত হয়েছে! বলি, পুরুষ হ'য়ে পুরুষের নিন্দাটা সহ্য করতে পারছ না, না?

অতি ধীরে ধীরে ক্ষিতীশ কহিল, না বৌদিদি—এ পুরুষ ব'লে নয়, এ যে ভাই-ভাইয়ের কথা! আমি শুধু ভাব্‌ছি, আমাকে এ সমস্ত কথা শুনিয়ে আপনার লাভ কি? আপনারা দু'জনেই আমার গুরুজন—আপনাদের দু'জনকেই আমি যেন সেই সম্মানই চিরকাল দিতে পারি। এর বেশী আমি আর কিছু চাই না।

ঠাকুরপো, 'আপনি' বল্‌লে কারুকে সত্যিকালের পর করা যায় না। তুমিও কি আমায় শেষে ঠেলে ফেল্‌তে চাও?

না বৌদিদি, ঠেলে আমি কাউকেই ফেল্‌তে চাই না, শুধু আমার কর্ত্তব্য যা তাই করতে চাই।

শুধু একটুখানি কর্ত্তব্য, আর কিছু নয়? বলিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

সে যে কি বলিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। কিছুদিন ধরিয়া একটা দুর্ব্বলতা তাহাকে নাচাইয়া বেড়াইয়াছিল কিন্তু অনেক কষ্টে নিজেকে সে সংযত করিয়াছে। তাই বৌদিদির পাশে বসিয়া তাঁহার সেবা করিতে করিতে প্রতিনিয়ত সে নিজেকে সজাগ করিয়া রাখিয়াছে, যেন কোনও ফাঁকে তাহার দুর্ব্বলতা মাথাচাড়া দিয়া না ওঠে। একবার এমনও তাহার মনে হইয়াছিল যে, সে আর তাঁহার সংস্পর্শে আসিবে না; কিন্তু তাঁহাকে এই কঠিন রোগের মধ্যে শুধু ডাক্তারের অনুকম্পার উপর ফেলিয়া রাখিতেও কোথায় যেন তাহার একটু বাধিল। তাই নিছক কর্ত্তব্যের অনুরোধেই সে আবার পীড়িতা মনোরমার বিছানার পাশে গিয়া বসিল। তিনি যখন জানিয়া হউক, না জানিয়া হউক, তাহার সেই ক্ষতস্থানটার উপর আঘাত করিলেন, তখন ভয়ে ও দুঃখে তাহার চোখ দু'টা জ্বালা করিতে লাগিল; এবং কি বলিয়া যে, সেখান হইতে উঠিয়া পলাইবে তাহারই পথ খুঁজিতে লাগিল।

মনোরমা হাসিয়া কহিল, তোমার মুখটা যে মরার মত সাদা হ'য়ে গেল ভাই—এ আর এমন কি কথা! তারপর ঈষৎ গম্ভীর হইয়া কহিল, তাহলে কি আমি সব ভুল বুঝেছি বল্‌তে চাও?

শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে ক্ষিতীশ কহিল, আমি কিছু বল্‌তে চাই না বৌদি,' শুধু এই খবরটা তোমায় জানাতে চাই যে

শয়তান তার সমস্ত শয়তানী নিয়ে আমার কাছ থেকে অনেক দূরে পালিয়ে গিয়েছে। আর আমাকে লুকিয়ে বেড়াতে হবে না। আজ আমি শান্ত—স্থির।

তাই না কি? কিন্তু এ সুসংবাদটা ত আমি আগে পাইনি!

ক্ষিতীশ ইহার প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গে এতটুকু বিচলিত হইল না, বরং অধিকতর দৃঢ়ভাবে কহিল, কি জান বৌদি,' বড় বড় দু'টো চোখ থেকেও অনেক মানুষ খানায় পড়ে যায় শুনেছ ত? আমারও হয়েছিল সেই অবস্থা! তারপর কি কষ্টে যে তা' থেকে উঠে এসেছি তা' আমিই জানি!

বলি, তুল্‌লে কে? নিজে না আর কেউ? বলিয়া মনোরমা যেন এক ঝলক হাসি কাপড় দিয়া মুছিয়া ফেলিল।

ক্ষিতীশ কিছুই লক্ষ্য করিল না। কহিল, উঠ্‌তে হয় ত পারতুম না বৌদি,' যদি না মা আমায় কৃপা করতেন! হঠাৎ একদিন রাত্রে কি অমৃতবাণী নিয়েই মা আমার ঘুমের মধ্যে এসে উপস্থিত হলেন! সকালবেলায় উঠে দেখি আমি একবারে বদলে আলাদা হ'য়ে গেছি! তারপর অনুতপ্তভাবে কহিল, পাপের কি জ্বালা বৌদিদি তা' আমিই জানি!

মনোরমা কহিল, যদি জান ঠাকুরপো, তবে এ পথে নেমেছিলে কেন?

সে ত তোমায় বলেছি বৌদি'।

ওঃ, হাঁ—ঐ খানার উপমাটা, নয়? আচ্ছা, সকলেই ত অমৃতবাণী শুনতে পায় না—তাদের গতি কি হয় ঠাকুরপো?

ক্ষিতীশ উত্তেজিত হইয়া কহিল, অন্যায়কে অন্যায় জেনেও যে

জোর করে সেই পথে চল্‌তে চেষ্টা করে, শাস্তি তার পালিয়ে যায় না বৌদি,'—একদিন না একদিন সে শাস্তি তাকে ভোগ কর্‌তেই হয়।

কিন্তু রাজার আইন ত সব অপরাধীর জন্য নয় ঠাকুরপো।

ক্ষিতীশ কহিল, হাঁ, তা' হয় ত নয়; কিন্তু সমাজের শাস্তি—তাকে ত ফাঁকি দেওয়া যায় না।

কেন? সে আমার কে?

সে-ই যে সব বৌদি'। প্রথমটা মনে হয় বটে, সে কেউ নয়। কিন্তু একটু ভেবে দেখ্‌লেই যে, সে মিথ্যা ধরা পড়ে যায়। আমিও ত ভেবেছিলুম কিসের সমাজ—কি তার শক্তি? কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ত তা' রাখ্‌তে পার্‌লুম না। কি জান বৌদি,' ভালবাসা বল, প্রেম বল, এর সব মর্য্যাদাই ঐ সমাজটার উপরে নির্ভর করে। তাকে বাদ দিয়ে ত কোনদিন কোন প্রেম সসম্মানে বেঁচে থাকৃতে পারে না। পরে, মিনতি স্বরে কহিল, উপদেশ দেওয়ার ধৃষ্টতা আমার নেই, কিন্তু তোমার পায়ের তলায় বসে একটা কথা তোমায় বল্‌তে পারি, যদি তুমি অপরাধ না নাও।

না। তুমি নিশ্চিন্তে বল, বলিয়া অকারণেই সে তাহার গায়ের চাদরটা আরও একটু টানিয়া লইল।

ক্ষিতীশ কহিল, এই যে একটু আগে একটা বস্তু ইঙ্গিত কর্‌ছিলে বৌদি,' এর সমস্ত মর্য্যাদা যে স্বামীর উপরেই নির্ভর করে, এ কথাটা ত ভুল্‌লে চল্‌বে না। স্বামী খোঁড়া হোক্, অন্ধ হোক্, যোগ্য হোক্, অযোগ্য হোক্, তাঁকেই স্বামীর সকল

মর্য্যাদায় সম্মানিত করাতেই ত নারীত্বের পূর্ণ প্রকাশ। একে বাদ দিয়ে যে নারী বড় হ'তে চেষ্টা করে, কোনদিনই সে সম্মান লাভ করে না। তারপর ধীরে ধীরে কহিল, আমায় ভুল বুঝ না বৌদি,' আমি তোমায় শিক্ষা দিতে এ সব কথা বল্‌ছি না। শুধু আমার নতুন শিক্ষার দু'টো একটা কথাই তোমার নিকট প্রকাশ কর্‌ছি। এতে যদি কোথাও কিছু অপরাধ করে থাকি, নিশ্চয় তুমি আমায় ক্ষমা কর্‌বে—এ বিশ্বাস আমার আছে।

বিশ্বাস না থাক্‌লেও বড় বেশী এসে যাবে না ঠাকুরপো! কিন্তু যদি এতই বুঝেছ, তাহলে—হঠাৎ মনোরমার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

ক্ষিতীশ এবার উত্তর করিল না, শুধু ক্ষমাপ্রার্থীর মত তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

মনোরমা কয়েক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় কহিল, তাহলে তুমি এখন সাধু—মহাপুরুষ হয়েছ বল!

ক্ষিতীশ নির্ব্বাক্। তাহার সমস্ত শরীরটা যেন ভিতরে ভিতরে হিম হইয়া গেল। মনোরমা বলিতে লাগিল, দেখ, তুমি আমার অনেক করেছ; তোমার প্রতি আমার একটা কৃতজ্ঞতা আছে, এত সহজে তোমায় আমি ত্যাগ করতে পারি না।

ক্ষিতীশ এইবার কথা কহিল। বলিল, আমি যা করেছি তা' নিছক কর্ত্তব্য বলেই করেছি—এতে তোমার এতটুকুও কৃতজ্ঞ হ'তে হবে না। এখন আমি চল্‌লুম, বলিয়া সে উঠিয়া গেল।

নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া সেই প্রস্থানোদ্যত মনুষ্য মূর্ত্তিটীর দিকে মনোরমা চাহিয়া রহিল। তারপর, হঠাৎ একটা তীর আসিয়া কাহারও বুকের ঠিক মাঝখানটীতে বিদ্ধ হইলে, সে যেমন একটা আর্ত্তনাদ করিয়া ভূমিতলে আছাড় খাইয়া পড়ে, তেম্‌নি ভাবেই মনোরমা বিছানার উপর আছাড় খাইয়া পড়িল। এবং কতক্ষণ যে এই ভাবে কাটিল তাহা তাহার হুঁস্ ছিল না। খানিকটা পরে সে চোখ চাহিল। দেখিল, ঘরের কোণে প্রদীপটা মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে—কিছুক্ষণ পরে হয় ত তাহার আয়ু ফুরাইয়া যাইবে। অতি কষ্টে সে উঠিয়া বসিল। এবং ধীরে ধীরে বিছানা হইতে নামিয়া জলের কলসীটা এদিক ওদিক খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। অসহ্য তৃষ্ণায় তাহার সমস্ত কণ্ঠ শুকাইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ঈপ্সিত বস্তুটীর কোন সন্ধানই সে পাইল না। উঃ! বলিয়া আবার সে শুইয়া পড়িল। এবং পরক্ষণেই সমস্ত মাথাটা যেন তাহার লাটিমের মত বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতে লাগিল। নিজের হাতদু'টা দিয়া সজোরে সে মাথাটা চাপিয়া ধরিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু রোগক্লিষ্ট ক্ষীণ হাতদু'খানি তাহার কোন কাজেই লাগিল না। ঘরের দরজা খুলিয়া কে একজন ভিতরে প্রবেশ করিল। অতি কষ্টে মনোরমা তাহাকে চিনিতে পারিল, কিন্তু একটী কথাও সে কহিতে পারিল না, শুধু ক্ষীণ হাতখানি মুখের উপর তুলিয়া তাহার নিকট একটু জল ভিক্ষা করিল। তারপর অস্ফুটস্বরে কহিল, ছোটবাবু কোথায় রে?

তিনি এইমাত্র বাহিরে গেলেন যে মা।

মনোরম ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর কাগজ কলম

লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কি একটা লিখিতে চেষ্টা করিল কিন্তু প্রচণ্ড অশ্রুর বেগে তাহার সে চেষ্টা সফল হইল না। শেষে প্রাণপন শক্তিতে অশ্রু সম্বরণ করিয়া সে স্বামীর উদ্দেশে লিখিল, ওগো, তুমি এস,—আমার প্রায়শ্চিত্ত কি শেষ হয়নি ?

ঠাকুর এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল, সে কহিল, বাবুকে কি খুঁজে দেখ্‌ব মা ?

যাও। বিরক্ত ক'রো না, বলিয়া মনোরমা নির্জ্জীবের মত বিছানার উপর শুইয়া পড়িল।

হঠাৎ একটা দম্‌কা হাওয়া আসিয়া দীপটা নিভাইয়া দিল,—মনোরমা সেই নির্ব্বাপিত দীপের সলিতার রক্তের মত রাঙা অগ্নিস্ফুলিঙ্গটীর পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

